SPANDAN 2020

স্পন্দন ২০২০

সূচিপত্র

শীতের প্রার্থনা 3

সেই সব দিন 7

This Storm Will End Someday 11

মা তোমার কথা মনে পড়ে না 13

দীপক মঞ্জরী 16

MY LITTLE TEACHERS 21

ছোঁয়াচ 27

Tomorrow Maybe 33

স্বর্গ ভ্রমণ 34

হতভাগ্য ঈশ্বর 35

The Role 38

ঘড়ি 42

The Lazy Boy 47

Seventeen 48

গোধূলির ছায়া নামে ধীরে 50

WHO IS THE BEST? 54

The Empty Nest 58

The 100nm Weapon of Mass Destruction 60

নাটকের বৈঠক 63

Experience of PPBP Theatre 71

শীতের প্রার্থনা

" কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়-স্পন্দন
চক্রে পিষ্ট বক্ষ ফাটা তারার ক্রন্দন।

সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে...

হে বন্ধু বিদায়। "

২০২০র শারদীয়া উৎসব শুরুর আগে থেকে, প্রায় মাসাধিক কাল ধরে, বাঙ্গালীর হৃদয়ে আশংকার গুঞ্জন হয়ে ধ্বনিত হচ্ছিল এক ধীরোদাত্ত নায়কের মন্দ্রগম্ভীর স্বরে 'শেষের কবিতা'র শেষ কবিতাটি। উৎসবের সমাপ্তিকালে দীপাবলীর শেষ প্রদীপটি নিভে যাবার আগেই নিভে গেল বাঙ্গালী জীবন ও মননের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের জীবনপ্রদীপ। আবৃত্তিটি রয়ে গেল কণ্ঠস্বরের অধিকারীর আশ্চর্য এপিটাফ এর মতো। বাঙ্গালীর স্বর্ণযুগের ওপর ধীরে ধীরে পড়ছে যবনিকা। অধিকাংশ প্রদীপই নির্বাপিত। যারা রয়েছেন, তাঁদেরও একে একে নিভিছে দেউটি। তবে শুধু বাঙলা নয়, ২০২০ তে আমরা হারিয়েছি ভারত তথা বিশ্বের অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র - বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প-ক্রীড়া জগতের, মানবসমাজের সর্ব স্তরের।

এ বড়ো সুখের সময় নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিশ্বযুদ্ধ দুটির পরে মানুষ এমন মৃত্যু মিছিল দেখেনি। সংক্রামক মহামারীর ভয়াবহ সংহার শক্তি - সেও ছিল এক শতাব্দীপ্রাচীন ধূসর স্মৃতি। আর সেই সময়ের তুলনায় প্রযুক্তি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীবপ্রযুক্তিবিদ্যায় যে অদ্ভুতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে, তার ভরসায় আমরা ধরেই নিয়েছিলাম - সংক্রামক মহামারীকে আমরা ফেলে এসেছি ইতিহাসের পাতায়। মানুষের অগ্রগতি দুর্নিবার বটে, তবে প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী রূপের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কোনদিনই সহজসাধ্য নয়।

গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার এর ২০২০ সাল - মহামারী-ঝড়-ঝঞ্ঝা-ঘূর্ণিবাত-রাজনৈতিক অস্থিরতা - স্মরণাতীত কালে এমনটি আমরা আর দেখিনি। মহামারীর করাল গ্রাসে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, অনাথ হয়েছে অজস্র শিশু-কিশোর, আশ্রয়-সম্বলহীন হয়েছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থ মানুষ। চলেছে অভূতপূর্ব আর্থিক সংকট - জীবন-জীবিকার অপ্রতুলতা, ব্যবসা বাণিজ্যে ভয়ঙ্কর মন্দা। নিশ্চিত চাকুরীজীবিদেরও বেড়েছে নির্ভরশীল, আশ্রিত, অনুগৃহীতের সংখ্যা।

আর ঠিক ততখানি ভয়াবহ না হলেও মধ্যবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনও হয়ে উঠেছে সবিশেষ জটিল। সারা বিশ্বেই, বিশেষতঃ নারীদের জীবন ব্যস্ততর হয়েছে অনেকখানিই। একদিকে কর্ম সহায়ক-সহায়িকাদের বাধ্যতামূলক অনুপস্থিতি, অন্যদিকে সমস্তরকম সহায়ক বন্দোবস্ত - বেবিকেয়ার সেন্টার, বা নিদেন পক্ষে অফিস ক্যান্টিনে এক কাপ কফি - সেটুকুও হয়ে গেছে অপ্রতুল। সেই জন্য এমনকি বিশ্বের এগিয়ে থাকা দেশেও পেশাগত ক্ষেত্রে নারীদের কাজের লক্ষণীয় ভাবে অধোগতি হয়েছে।

তবুও, সমস্ত দুর্যোগ মাথায় নিয়েও মানুষ উঠে দাঁড়ায়। জীবনকে ভালোবেসে মানুষ -

" আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায় - অনুমেয় উষ্ঞ অনুরাগে।"

আর ক্ষয়ক্ষতির পাল্লা বেশীর দিকেই যদিও, প্রাপ্তির ঘর একবারেই শূন্য এমনও তো নয়। কাছের মানুষ, ব্যস্ততার ঘূর্ণিপাকে প্রায় অচেনা হয়ে যাচ্ছিল যারা - নতুন করে তাদের সঙ্গে ছন্দোবন্ধন করবার সুযোগ মিলল অনেকেরই। দূরপাল্লার হলেও অনেক শিশু-কিশোরই চমৎকার এগিয়ে নিল নিজের নিজের পড়াশোনা। সশরীরে ইশকুল যাবার বাধ্য-বাধকতা না থাকায় কেউ কেউ আবার ফিরে গেছে গ্রামে, যৌথ পরিবারে দাদু-দিদিমা-ঠাকুমার ছত্রছায়ায়। কেউ পড়ছে অজস্র বই, দেখছে অজস্র সিনেমা। কর্মব্যস্ত বাবা-মাকেও পাচ্ছে হাতের নাগালে। দূরের আত্মীয়দের সঙ্গে সচিত্র-দূরভাষে কথা হচ্ছে, যেসব 'হবি' কোনকালে ছিলনা সেসবের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রজন্মের ছোটরা, বিশেষ করে ব্যস্ত নাগরিক জীবনে বড় হয়ে উঠেছে যারা, তারা পেল

একটা অন্যরকম সময় - আকাশ দেখে, পাখির গান শুনে, ভীড় থেকে দূরে - নিজেকে চেনার জন্য।

এই নতুন প্রজন্মই আমাদের আশা। এবছর কালী পুজো ছিল ১৪ই নভেম্বর। আজ থেকে ১২২ বছর আগে, ১৮৯৮ সালে কালীপুজো ছিল ১৩ই নভেম্বর। মাত্রে এক দিনের তফাত। আর সেও ছিল এক মহামারীর বছর। মানুষের সেবায় কলকাতার পথে সেই সময় নেমেছিলেন সুদূর আয়ারল্যান্ড এর এক কন্যা। ভারতবর্ষকে ভালোবেসে, ভারতের মেয়েদের জন্য ইশকুল গড়েছিলেন তিনি। সেই ইশকুলের শুরু ঐ কালীপুজোর দিনেই। মহামারী শেষে নতুন এক সময়ের সূচনা হয়েছিল সেই দিনে।

আসলে নতুন সূচনা, নতুন সম্ভাবনার কথাই সমস্ত কবির, সমস্ত কবিতার মূল মন্ত্র। তাই জীবনের ছন্দে ফেরার, জীবনের গানে ফেরার কথাই বন্দিত হয় বারবার। কারণ জীবন সর্বদাই শীত থেকে বসন্তে উত্তরণের গল্প। তাই,

" এ নয় গানের দিন
বৎসরের হ্রস্বতম দিনে
স্বল্প সূর্যালোক ন্যূনতম তাপ আর
কুয়াশায় আচ্ছন্ন আভার চাঁদ

তবু তো শীতেই আশা, দুরাশাও

এই শীতে গান।
এই শীতে গান নেই, যদি না বানাই আমি

কারণ পাখিরে দেয়নি গান, পাখিরে দিয়েছে শুধু ডাক
আমারে দিয়েছে গান, আমি তাই গানেরেই ডাকি,

তাই গান,
বানাতেই হবে গান, বাস্তবের স্বাস্থ্যে ফিরে যেতে। "

বাস্তবের স্বাস্থ্য ফিরে যেতে, সমস্ত নতুন সূচনা, নতুন সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে, শারদীয়া উৎসবের শেষে, নতুন দিনের উৎসবকে আহবান করে প্রকাশিত হল আমাদের পত্রিকা - স্পন্দন ২০২০।

ঊদ্‌ধৃতি সূত্র:
শেষের কবিতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আট বছর আগের একদিন - জীবনানন্দ দাশ
মৃত্যুর পরে, জন্মের আগে - বুদ্ধদেব বসু

সেই সব দিন

সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য

আমার শৈশব, কৈশোর কেটেছে ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের ক্ষুদ্র একটি রাজ্যের ক্ষুদ্রতর রাজধানীর উপকণ্ঠে। রাজ্যটি ত্রিপুরা আর শহরটি আগরতলা। যদিও রাজধানী, তবু সে অর্থে সেই শহরে শহুরেপনা বিশেষ ছিলনা। ছোট ছোট রাস্তা, অনেক গাছ-গাছালি, পুকুর, দিঘী নিয়ে একটা গ্রামীণ পরিবেশ ছিল বরং। শহরের এক কোণায় সবুজ টিলার ওপর বিস্তৃত এক কলেজ ক্যাম্পাস। ওই ছোট্ট শহরের সঙ্গে অনেকটাই বেমানান যেন। প্রাকস্বাধীনতা যুগে যখন ত্রিপুরা ছিল দেশীয় রাজার অধীনে, রাজ্যের শেষ রাজা, বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর ৬৪ একর জমি দিয়েছিলেন কলেজটি তৈরী হতে। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ। গড়ে ওঠে কলেজ টিলা ক্যাম্পাস।

কলেজ টিলার সুবিশাল এই ক্যাম্পাসের চারদিক ঘিরে সবুজের বিস্তৃতি। এক পাশে বয়ে যেত পাহাড়ী একটি নদী। নাম হাওড়া। না, পশ্চিম বাংলার হাওড়া জেলার সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। নামের ইতিহাসও আমার অজানা। তবে আমার ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা ওই নদীর পাশের সরকারী আবাসনে। একাধিক লেক, খেলার মাঠ নিয়ে এলাকাটি ছিল ছবির মতো সাজানো···গ্রাম ও শহরের এক অপরূপ মেলবন্ধন।

কলেজ

যা বলছিলাম···আমাদের বাড়ীর সামনে বয়ে চলত নদী। ও পাড়ে সবুজ বন, টিলা, ধানক্ষেত আর গ্রামাঞ্চল। আড়ালিয়া ও যোগেন্দ্রনগর নামে দু'টি গ্রাম ছিল সেখানে। আমাদের সকলের বাড়ীতে ঘরের কাজে সাহায্য করতে যাঁরা আসতেন, তাঁরা সব ঐ দুই গ্রামেরই বাসিন্দা। অন্যান্য পাহাড়ী নদীর মতোই হাওড়ার চেহারাও সারা বছর থাকত অতি নিরীহ। বর্ষাকালে পালটে যেত সে রূপ। ক'দিন বৃষ্টি মানেই নদী ফুলে ফেঁপে ভাসিয়ে দিত তার কূল। আমাদের আবাসনে যদিও জল আসেনি কখনো, কিন্তু বর্ষায় তার সেই চেহারা ছিল রীতিমতো ভয়ঙ্কর। ভেসে যেত ধানক্ষেত, গ্রামের ঘরবাড়ি। গ্রামবাসীরা আশ্রয় নিতেন আশে পাশের সবুজ টিলায়। জল সরে গেলে আবার তাঁরা ফিরে যেতেন তাঁদের রোজকার নিস্তরঙ্গ জীবনে।

হাওড়া নদী। অন্য দিকে আড়ালিয়া

হাওড়া নদী। অন্য দিকে যোগেন্দ্রনগর

আমাদের পাড়ায় ছিল একাধিক কৃষ্ণচূড়া গাছ···লাল ফুলে ভরে থাকত। একতলার বাসিন্দা অনেকেই ভারী সুন্দর বাগান করতেন। আমরা থাকতাম তিনতলায়। মা বারান্দায় লাগাতেন নানা ফুলের গাছ। অন্ধকার রাতে সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীল তারাঘন কালো আকাশ আর বনের ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের ছোট ছোট আলো দেখা ছিল আমার ভারী প্রিয়। সন্ধ্যাবেলায় আড়ালিয়া বাজারের পিদিমের আলোও দেখা যেত দূরে। প্রায়ই গ্রামের যাত্রা বা সিনেমা শো-এর ঘোষণা ভেসে আসত আমাদের কানে। সে এক অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ।

আমাদের আবাসনের আবাসিক প্রায় সবাই এসেছিলেন রাজ্যের বাইরে থেকে। স্বভাবতঃই, তাঁরা একে অপরের প্রতিবেশীর চেয়েও আত্মীয় ছিলেন বেশী। সুখে, দুঃখে, উৎসবে, বিপদে সবাই দাঁড়াতেন একে অপরের পাশে।

আমাদের ছোটদের জন্য তাঁরা কেউ বা জ্যেঠু, জ্যেঠিমা, কাকু, কাকীমা, কেউ বা মামা, মামীমা, মাসি, পিসি। অন্যায় করে বকুনি-কানমলা যেমন খেয়েছি, আবার স্নেহের প্রশ্রয়ের প্রাচুর্য্যও কিছু কম ছিলনা। আমাদের প্রতিবেশী দম্পতি, যাঁদের আমি মামা-মাসি সম্বোধন করতাম···তাঁরা আমার বহু অত্যাচার সহ্য করতেন হাসিমুখে। বছর দশেক বয়স পর্যন্ত আমি রাতের খাওয়া সেরে এক গুচ্ছ আনন্দমেলা নিয়ে ওঁদের বাড়ী চলে যেতাম।

আমাদের খাবার ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যেত এই রাস্তা

পড়তে পড়তে ঘুমিয়েও পড়তাম বেশীরভাগ দিন। মাসি কোলে তুলে বাড়িতে দিয়ে যেতেন। আর মামা তো ছিলেন আমার নিত্যসঙ্গী। স্কুলের সব গল্প মামাকে না বললে আমার দিন কাটত না।

আবাসনের পরিবেশ ছিল খুবই খোলামেলা। আমরা বাচ্চারা খেলে বেড়াতাম যত্র তত্র। যে

কোন সময় কারোর বাড়ী যাওয়া ছিল খুব সামান্য বিষয়। সরস্বতী পুজো, দোল, ঝুলন, ক্রিসমাস··· সবই পালন হোত। এ ছাড়াও নানা পিকনিক তো হোতই। রবিবার সন্ধ্যায় সবাই মিলে কারোর বাড়ীতে বসে সিনেমা দেখতে দেখতে চা সহযোগে আড্ডা দেওয়া ছিল সকলের খুব প্রিয়।

দোলের দিনের অপেক্ষায় সবাই উন্মুখ হয়ে থাকতাম। ছোট-বড় সবাই হই-হই করে রঙ খেলা; খেলার শেষে ছাতিম গাছের তলায় হারমোনিয়াম নিয়ে গান; সঙ্গে আশে পাশের বাড়ী থেকে আসা চা, হাতে তৈরী নানা সুস্বাদু খাবার উপভোগ; সন্ধ্যায় সবাই মিলে পিকনিক··· সে এক ভীষণ আনন্দের দিন!

অনেকগুলো লেকের একটি

দোল। হারমোনিয়ামে আমার বাবা।

ক্রিসমাস হত মূলতঃ বাচ্চাদের উদ্যোগে। মাসি-পিসিরা অনেকে আমাদের আব্দার মেনে নানা রকম খাবার বানিয়ে দিতেন। আমরা মহানন্দে যীশুর জন্মদিন পালন করতাম। শীতের দিনের আরেকটা আকর্ষণ ছিল ব্যাডমিন্টন। ব্যাচেলর্স কোয়ার্টার্সের পেছনের মাঠে কোর্ট বানিয়ে সন্ধ্যাবেলায় খেলত বাচ্চা-বুড়ো সবাই। বলাই বাহুল্য, আমি খুব খারাপ খেলোয়াড় ছিলাম এবং দর্শকাসনেই থাকতে পছন্দ করতাম। পরবর্তীকালে কলেজ ক্যাম্পাসে দুর্গোৎসবও পালন করেছি আমরা মহা ধূমধাম করে।

কোন এক সান্ধ্য আড্ডা।

আজ দু' যুগ পেরিয়ে এসেছি ওই মোহময় জগৎ ছেড়ে আসার পর। সেইসব পরমাত্মীয় অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। তবুও রাতের স্বপ্নে সেই কলেজ টিলাই আসে বারবার। শুনেছি ক্যাম্পাসের চেহারা এখন বদলে গেছে। গাছ-পালা কেটে ফেলা হয়েছে অনেক। আমার চোখে অবশ্য সেই সবুজ টিলাই রয়ে গেছে। থাকবে চিরকাল।

ছবি – ব্যক্তিগত সংগ্রহ

ANANYA CHOWDHURY
Grade 6
DAV PUBLIC SCHOOL

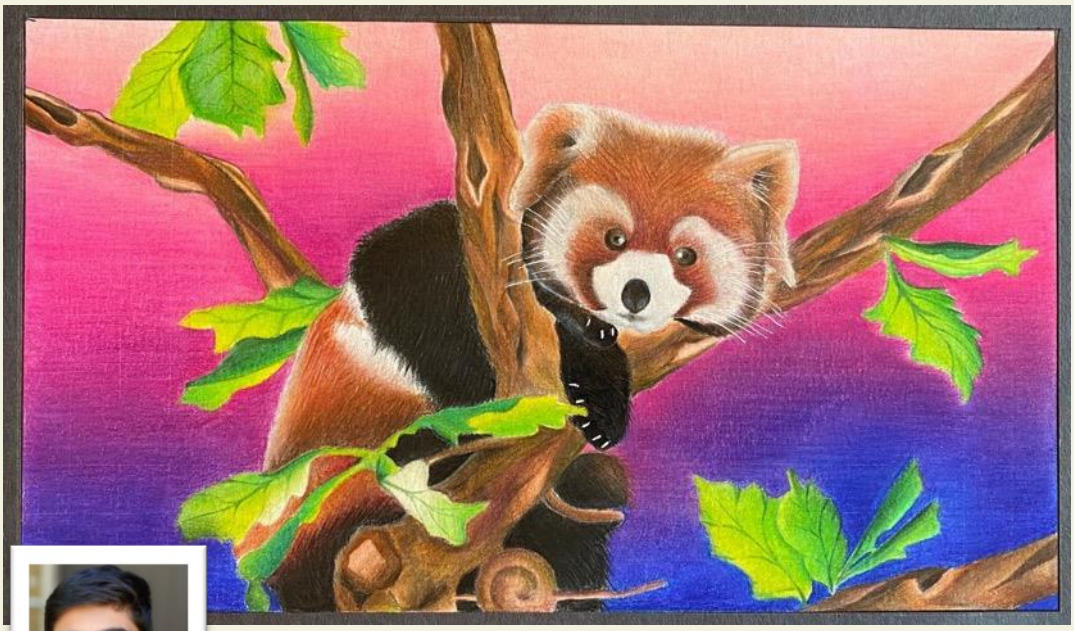

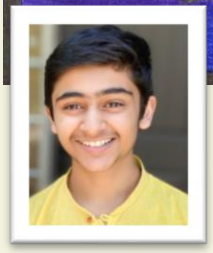

RISHAB BARVE
Grade 8

THIS STORM WILL END SOMEDAY

Neel Roy

The world is witnessing a new pandemic,
Who has no other work but to make people sick.
This might not be the best year to ask for something or to celebrate,
Whatever we have, we must learn to appreciate.
The whole world is waiting for this pandemic's cure,
One day this agony will end I am sure.
This pandemic has caused a lot of pain to all of us,
It is called the "Corona Virus".
People are imprisoned in their houses due to the lockdown,
This virus has dragged our morale down.
It's important for us to stay at home to keep the virus at bay,
And also so that we can live to fight another day.
Even though we are at home, we have become one,
The power of unity is stronger than the sun.
We must stay at home to keep the virus at bay,
I am sure that this storm will end someday...

NEEL ROY
Grade 8
Vibgyor High Balewadi

RAJYASHREE PAL

Rajyashree is an ardent lover of painting and music. Being a Master in Botany from Presidency College Kolkata, she has also completed Diploma in Fine Arts from Viswa Bharati University. She is an avid nature lover and her stitch work brings out the bonding of love between Radha and Krishna.

মা তোমার কথা মনে পড়ে না...

রিম্পা চট্টোপাধ্যায়

January মাস - 2020। নতুন বছর, নতুন টার্গেট, কাজের অপরিসীম চাপ। রোজ সকাল থেকে মাঝরাত অব্দি কাজ করে নিজের যোগ্যতা প্রমান করার যুদ্ধ।বলা বাহুল্য, এই অদৃশ্য প্রতিযোগিতার আমিও একজন প্রতিযোগী।

এইরকম এক ব্যস্ত দিনে মা ফোন করলো। বলল "তোর কি আমার কথা মনে পড়ে না এখন? তুই এতো ব্যস্ত! গত দু দিন তোর ফোন পাইনি। "

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলাম, বুকের ভেতরটায় কেমন যেন একটা ব্যথা অনুভব করলাম। আমি মাকে কিছু বলতে পারলাম না কিন্তু বুঝতে পারলাম যে আমি সেই মানুষটাকে আঘাত করেছি যাকে ছাড়া আমি এই পৃথিবীটা কল্পনা করতে পারি না।

কাজের মাঝে ভুলে গেছি হয়তো। ভারতের ম্যাপ এর নর্থ ইস্ট কর্নার এর ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার একটা নগণ্য শহর আগরতলায় এক মা রোজ সারাদিন শুধু বসে থাকে তার মেয়ের একটা ফোনের অপেক্ষায়।

পনেরো বছর আগে এই মা তার বুকে পাথর রেখে তার একা মেয়েকে দূর দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

আমরা নিজেদের জীবনে এতো ব্যস্ত হয়ে যাই এবং এতো দৌড়াতে থাকি যে সম্পর্ক গুলো কোথায় যেন পেছনে থেকে যায়, ফিরে যখন তাকাই আর খুঁজে পাই না। দৌড়ে যাওয়া সেই জায়গায় পৌঁছে বুঝি আসলে ওখানে আমরা একা।

20th মার্চ, 2020। শুরু হলো লকডাউন। আর হাজারটা মানুষের মতো আমিও বাড়ি থেকেই কাজ শুরু করলাম।

মায়ের সে কথাটা আমি ভুলতে পারছিলাম না। অফিসের কাজ করতে করতে মন হারিয়ে যায় জানালার বাইরে ঐ খোলা আকাশের পাখিদের দিকে যারা দিনের শেষে ফিরে আসে মায়ের কাছে। আজ তাই আমি ঠিক করলাম মাকে আমার মনের কথা জানিয়ে চিঠি লিখব।

"মা,

আমার প্রণাম নিও।

কেমন আছো তুমি? আমি ভালো আছি মা, তোমাকে এই চিঠিটা লিখছি তোমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে। জানি না এটা কবে তোমার কাছে পৌঁছাবে, তাও লিখছি।

তুমি ঠিক বলেছিলে মা। হয়তো আমি তোমাকে ভুলেই গেছি। আমার নিজের জীবন, সংসার, বাচ্চা, কাজ এ নিয়ে আমি খুব ব্যস্ত, তাই তোমাকে ফোন করার সময় আমার নেই।

কিন্তু এখনো কোনো কোনো সময় তোমার কথা মনে পড়ে। কখন জানো?

আজকাল যখন আর সকাল সকাল কেউ মাথায় চুমু দিয়ে আমায় ওঠায় না, মা তোমার কথা মনে পড়ে!

সকালে আদর করে যখন কেউ হাতে চা দেয় না, মাগো! তোমাকেই মনে পড়ে।

এখন যখন কেউ এই বলে আমার মাথা খায় না যে আমার পছন্দের কোন খাবারটা বানাবে, তখন মা তোমার কথাই মনে আসে!

সকালে অফিস যাওয়ার সময় যখন ভাতের থালা হাতে নিয়ে আমার পেছন পেছন কেউ দৌড়ায় না, তখন না মা তোমারই মুখটা সামনে ভেসে আসে।

মা গো অফিস পৌঁছনোর পর যদি কারুর কল না আসে যে আমি ঠিক ভাবে পৌঁছেছি কি না, তখন তোমার উপরই রাগ হয়।

আমার দুপুরে খাওয়া তো উঠেই গেছে প্রায়, ওই lunch বক্স আর ভালো লাগে না। তোমার হাতের ভাত আর ডিমের কষা ছাড়া আমার কি চলত? এখনো চলে না। তাই আমার দুপুরের বন্ধু এখন চা আর কফি।

বিকেলের চা হাতে যখন আজকাল মা মেয়ের গল্প হয় না, ঠিক তখন তোমার কথা খুব মনে পড়ে।

অফিস থেকে আসার পর আজ আর কেউ হাতে জলের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। সত্যি বলি? জলের গ্লাস ভরতে ভরতে আমার চোখেও জল আসে মা।

মা জানো, আমি ভুলেই গেছি যে আমি কি খেতে ভালোবাসতাম। তুমি যখন ফোনে মনে করাও তখন আমার মনে পড়ে আর মিছিমিছি বলে দি ঐটাই খাচ্ছি, কি করবো মা?

মা সারাদিনের অফিসের কি কি হলো আজ আর কেউ শোনে না।

খুব মন খারাপ হলে যখন কাউকে ধরে কাঁদতে পারি না আর নিজেকে সবার আড়ালে চানঘরে নিয়ে যেতে হয় - তখন মাগো আমার একমাত্র তোমাকে মনে পড়ে।

রাতে বেশিরভাগ আজ কাল খাই না। ইচ্ছে হয় না কিংবা যা পাই টেবিলে তাই খাই। নিজের ইচ্ছেটাকে প্রকাশ করার ইচ্ছেটাই হয় না, মাকে ছাড়া আর কার কাছে আবদার করতে পারি আমি? ঠিক সেই সময় তোমাকে মনে পড়ে।

তোমার মনে আছে মা? রাতে তুমি আমাকে রোজ মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে আর আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তাম। মাগো! আজ আর তোমার হাতের সেই কোমল স্পর্শও নেই আর নিশ্চিন্তের ঘুমও নেই।

মা শুধু এই কয়েকটা মুহূর্তে আমি তোমাকে মনে করি, আর তোমার কথা বেশি মনে পড়ে না। আমি তোমার অংশ মা, জীবনের এই প্রতিযোগিতায় যতই দৌড়াই বুকের শুধু একটাই টান - মা! মা! মা!

ভালো থেকো মা। বাবাকে প্রণাম
দিও।

ইতি,

তোমার মেয়ে

রিম্পা একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং একটি বিদেশী কোম্পানিতে চাকুরীরত। ভালোবাসে নাটক এবং কবিতা - ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন চরিত্রে নাটক করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় আবৃত্তি করেছে। এই লেখাটি প্রথমে হিন্দিতে লেখা হয়েছিল।

এই লেখাটা হচ্ছে তাদের সবার জন্য যারা নিজেদের মায়েদের থেকে দূরে রয়েছে - কেউ শিক্ষার জন্য, কেউ চাকুরীর জন্য আবার কেউবা নতুন সংসারের জন্য আর এই ব্যস্ত পৃথিবীতে যারা কখনো কখনো না চেয়েও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভুলে যায়।

RISHABH PAL
Grade 8
ST. MARY'S SCHOOL

দীপক মঞ্জরী

বর্ণালী মুখোপাধ্যায়

গৌরচন্দ্রিকা।।

পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদে দীপক ভট্টাচার্য বেশ পরিচিত নাম। গোবিন্দগার্ডেনের পুজোর কটা দিন তাকে ঘিরে আমরা কজন চমৎকার এক জটলা তৈরি করে আড্ডা দিতে থাকি। দিতেই থাকি মণ্ডলমহাশয়ের বিশুদ্ধ তেলে ভাজা ও চা সহযোগে। সন্ধেগুলি ব্যাপ্ত হতে হতে একেবারে গড়িয়ে রাত হয়ে গেলে মুন্সী মাসীমা এসে আলো নেভানোর ও চেয়ার তোলার ওয়ার্নিং দেওয়া ইস্তক সে মহফিল জমাট ক্ষীর। অতঃপর গল্পের গরু পুণের অলিগলিতে ঘুরতে থাকে। কারণ,পুজো উতরে যাওয়ার পরেও সে আখ্যান আমরা থামতে দিই না। গোবিন্দ গার্ডেন থেকে সেইসব কাহিনী কিস্স্যা দীপকদা সুদেষ্ণাদিদের আউন্ধের বৈঠকখানায়, আমাদের সপ্তাহান্তিক প্রধান আকর্ষণ। এবং অবশ্যই,স্বয়ং ব্রহ্মা, থুড়ি দীপকদার মুখ থেকে না শুনলে সে গল্প জল মিশে গপ্পো! সেই বলবার স্টাইলটা না থাকলে, কাহিনীরা বিনা ঝোলাগুড়ের পাঁউরুটি। তবু এক দুটো আপনাদের না শুনিয়ে পারলাম না।

এই যে এবারের পুজো আছে কিন্তু নেই গোছের অবস্থানে,কেবল চিত্ত শুদ্ধির জন্য এ এক মোক্ষম বটিকা! আমারও তো কিছু সামাজিক দায়দায়িত্ব আছে মশাই!!

দীপক মঞ্জরী ১ – রুদ্রবীণা আদি।।

একদা, বারুইপুরে তাদের এলাকার কতিপয় সিরিয়স, একাগ্র পড়াশোনায়,ঈষৎ কবিটাইপ, কিশোর,বালক, নাবালক ও তরুণ মিলে ঠিক করলো একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতেই হবে। নচেৎ, এতো সব উৎসারিত পদ্য,গদ্য সব মাঠে মারা যায়!

এখন সেই ভট্টাচার্য্য পাড়ায় ও তার আশেপাশে কবি ও সিরিয়স জনগণই কি কেবল থাকতো নাকি? বসন্ত কি কেবলই ফোটা ফুলের মেলা রে? ফুলে কি কেবল প্রজাপতিই বসে? মৌমাছি আর ভোমরারা কি নেই না কি?

তো ভোমরারা খবর পেলো শুভর (বানানো নাম, রিস্ক নেবো না বাপু)বাড়িতে বিকেল বেলা মিটিং আছে পত্রিকা সংক্রান্ত। সবথেকে ফোক্কড় যেটি, সে আর একটি রোমহর্ষক খবর দিল, শুভর মা পাকা রাঁধুনি, তিনি, এই উপলক্ষে বানাবেন মাংসের ঘুঘনি।

ব্যাস আর যায় কোথায়। বিকেল বেলা, সাহিত্য পিপাসুদের ভিড়ে শুভদের বৈঠকখানা উপচে পড়ে আর কি! সিরিয়াসদের, সিরিয়স আলোচনা চলছে।এদিকে, দীপকদাও তারই মতো সাহিত্য প্রেমিকরা,তৃষিত চাউনিতে ভেতর ঘরের দিকে তাকিয়ে আছে।

যা হোক, সময় মতো চা, নিমকিটিমকির সঙ্গে বাটি ভর্তি মাংসের ঘুঘনিও চলে এলো। সে সব হাতে আসতে ও পেটে যেতে, সকলেরই মাথা ধাঁই ধাঁই করে খুলে যেতে লাগলো। কে বলে

সাহিত্য শিল্পের সঙ্গে কেবলই হৃদয়ের যোগাযোগ। পাকস্থলীর যোগাযোগ আরো গভীর মশাই!!

সে সময় পত্রিকার নামকরণ নিয়ে কথাটথা চলছে।

শুভ গাম্ভীর্য সহকারে ঘোষণা করলো, ভাবছি আমাদের এই পত্রিকার নাম হোক রুদ্রবীণা।

চাদ্দিকে তো ধন্য ধন্য রব।

ইতিমধ্যে মাংসের ঘুঘনি শেষ করে,চামচটাও চেটেপুটে, সদ্য সাহিত্যিক নবা (এই নামটাও মনগড়া,সেই রিস্ক ইত্যাদি) অত্যন্ত অমায়িক স্বরে বললো, আমার এ বিষয়ে, একটি বক্তব্য আছে। এই নামকরণ নিয়ে আর কি!

সকলে, তার দিকে তাকাতে সে আরো বিনীত ভঙ্গিতে বললো-রুদ্রবীণা ভালো নাম, খুবই ভালো, তবে ,ঝিঙ্কুমনা, মিন্টু সোনা ,হলেও খারাপ হতো না।।

ততোক্ষণে ঘুঘনি নিমকি শেষ। পালাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।।

দীপক মঞ্জরী ২ - ছকবাজি।।

ভয়াবহ তেতো এবং কষ্ঠিপাথরকে টেক্কা দেওয়া কালো কফিতে চুমুক মেরে দীপকদা যখনই আহহহা করে তৃপ্তির হাঁকটি পেড়েছে, আমরা বুঝে গেলাম এইবার জবরদস্ত গল্প আসতে চললো।

হলো ও তাই। কাপটা রেখে, টেবিলটপকে তবলা জ্ঞানে চাট্টি বোল বাজিয়ে দীপক দা বললো,-"বুঝলি, আমাদের সেই বারুইপুরের ফেমাস ভট্টাচার্য পাড়া হলো গিয়ে পুরো ছকবাজ পাড়া!!"

আমি তো নড়েচড়ে বসলাম। বাইরে বেশ মারকাটারি পড়ন্ত বেলা, লাগসই গোধূলি বলে যাকে!এ সময় প্রেমের গল্প জমবে ভালো, তবে কি না দীপকদা,ঢলঢলে বিকেলে বসে বসে রোমান্টিক গল্প বলবে,এটা বাপ্পিলাহিড়ির লঙ্গে বিশুদ্ধ হিন্দির থেকেও অবিশ্বাস্য।

তবু কথা এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, -"ছকবাজ মানে?খুব প্রেমটেম হতো বুঝি? "

ইনফরমেশনটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দীপক দা আবার কফিতে চুমুক দিয়ে বুদ্ধরূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ কিনা, তথাগত সেখানে ফিরে গিয়েছে, মানে ভাবনায় ডুব। দেখবেন, ভালো গল্প বলিয়েরা শ্রোতাকে ভাববার, আর ভেবে ভেবে অস্থির হওয়ার বেশ খানিক সময় দেয়। সময় দেয়, আর আধবোজা চোখে খেয়াল করতে থাকে এফেক্টটা কি? বুদ্ধও ওরম করতেন। দীপকদাও করে।

একটা গ্যাপ দিয়ে দীপকদা তাচ্ছিল্যের' ধুস 'বললো এবার লম্বা করে। বললো -"প্রেম আবার কি?ও সব তো আমাদের পাড়ায় জলভাত। ওর জন্য ছকবাজ হতে হয় নাকি?"

তা বটে!বিখ্যাত ভট্টাচার্য পাড়ায় যে রক্ত দিয়ে লাব্বুউউ লেখার জন্য পেটফোলা মশা মেরে মেরে খুন জমানো হতো,সে রোমহর্ষক গপ্পো আগেই শুনেছিলাম। বাঙালী রক্ত দিতে কবে আর ঘাবড়েছে। রাত আটটার পরে ছাতে গিয়ে-

'ওরে মশা, আয় মশা ,আমাদের কামড়া রে',বলে বন্ধুর জন্য বন্ধুদের সে কী আত্মত্যাগ!!

তাছাড়াও ক্লাস সেভেন এইট থেকেই সেখানে ছেলেপুলেরা লভ লেটার লেখায় বেশ পোক্ত হয়ে ওঠে। তারা নিজের ও মেয়ের বাপের যুগপৎ প্যাঁদানির হাত থেকে বাঁচতে ছদ্মনাম নিয়ে নেয়। তা বলে, মজনু–টজনু নয়। বীর রসাত্মক প্রেমের রচনা লিখবে বলে শুনেছি, এক বালক নিজের নাম লিখেছিল "টাইগার"!! যদিও শেষ রক্ষা হয় নি। তার জঘন্য হাতের লেখা দেখেই সেই খতরনাক কিশোরী তার বাপের কাছে গিয়ে---'এ্যাঁ,এ্যাঁ, দ্যাখো কাকু, বল্টু আমাকে নাম পাল্টে কেমন অসভ্য চিঠি দিয়েছে' বলে তাকে বেধড়ক পেটানি খাওয়ালো, সে সব অন্য গল্প। তার সঙ্গে ছকবাজ ব্যাপারটার যোগ নেই।

-"আসলে আমাদের পাড়ায় এমন একটা কিছু ছিল, মানে জলবায়ুতেই বলতে পারিস, যে কিনা ঐ পাড়ার ত্রিসীমানায় আসতো,সেই বেশ লায়েক হয়ে উঠতো,যাকে বলে দিমাগ কী বাত্তি জ্বলে উঠতো,বুঝলি, যেমন সেবার সেই উট!"

উট!সে আবার কোত্থেকে এলো?উট কে? উফফ!! আবার দেখি, যেন ভাবতে বোসো না।

মুচকি হেসে, দাদা বললো, "উট মানে উষ্ট্র। সে কোত্থেকে এলো? চিড়িয়াখানা থেকে নয়। হতে পারে সাহারা থেকে, হতে পারে থর মরুভূমি থেকে, তবে যদ্দুর মনে হয় উটটার আমদানি হয়েছিল রাজাবাজার বা ঐরম কোথাও থেকে। ইদ আসছিল। কুরবানীর উট কিনে নিয়ে, এক ভালোমানুষ চাচা, আর তার ভ্যাবল মতো ভাইপো কুলপি রোড ধরে চলেছে নিজেদের মহল্লায়। আমরা বসেছিলাম রাস্তার ধারে কালভার্টের উপর। গজল্লা করছি। বেশ এরকম বিকেল , সন্ধে হবো হবো। "

দীপকদা বলে চল্লো।

কাকার হাতে উটের গলার লম্বা দড়িটা ধরা। ভাইপো পিছন পিছন। উটটার নিরীহ মুখ,আর ঢুলুঢুল চোখ, চারটে পায়ের লগবগে চলা সব ঠিক ই ছিল। কিন্তু যেই না তারা সেই ফেমাস ভট্টাচার্য পাড়ায় পা রেখেছে, উট কেমন যেন করে উঠলো। আমরা কেউই বোধহয় উটকে অজ্ঞান হতে দেখি নি। আমি শিওর। কিন্তু দীপক দা দেখলো। ওদের কাছাকাছি আসতেই সেই উট হঠাৎ চোখমুখ উল্টে, কষ দিয়ে ডবল ফেনা গড়িয়ে,মরে গেলুম, পড়ে গেলুম,এতো কি সয়,এসব এক্সপ্রেশন দিয়ে,, ধরাস করে উল্টে রাস্তার ধারের নালায় গিয়ে পড়লো। সে সব গোঁগোঁশব্দে,দীপকদারা ছুটে এলো।চাচা আর ভাইপো দুজনেই তাজ্জব!তারাও খুদা তালার দুনিয়ায় উটকে সেন্সলেস হতে নিঘঘাত দেখে নি।

তো, সকলে মিলে, ও উট উঠে পড়ো,উঠে পড়ো, এমন করতে নেই, একটু ইলেকট্রল গুলে দোবো নাকি, এসব করে উটকে খোঁচালো কিন্তু, সে নট নড়ন চড়ন।

চাচা ভাইপোর তো মাথায় হাত।

এখন কী করা!!এতোটা পথ এসে, উটটা যে ড্রেনে পড়ে দেহ রাখবে, কে কবে ভেবেছিল!

ভাইপো বলে, অ সাসা!এ বিমার উঁট দেসে না কি গো?

চাচা খিঁচুনি মেরে বললো, আমি কি জানি?? আমায় জিগোও ক্যান?আমি কি পয়গম্বর?

এসব কথাটথা, হা হুতাশা চলছে, দীপকদারাও কে কবে উটে চড়েছে, উট ব্যাপারটা খেতে কেমন এসব গালগপ্পো ঝালাচ্ছে, এমত সময়ে চাচা বললো ভাইপোকে, তুই হেথায় দাঁইড়ে থাক! ঝেতি বলো ক্যানে, আমারে এট্টু হালকা হতে হবে।।

বলে উটের গলার লম্বা দড়িটা, যেটা সে তখনো ধরে ছিল, ভাইপোর হাতে দিয়ে কাকা গেলো একটু দূরে হালকা হতে।

বন্ধুগণ। গুস্তাফি মাফ। স্বচ্ছ ভারত অভিযান তখনও দূর অস্ত্।

কাকাও গিয়েছে, ঝুপসো আঁধার ও ঘনাচ্ছে,দীপকদারাও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে, এমত সময় এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল মশায়!সেই ভিমড়ি খাওয়া, প্রায় দেহ রাখা উটটা, ধড়মড়িয়ে উঠলো। যে ভাবে চাদ্দিকে

খুলে গেল!সে ছকে নিলো, যে অ্যাক্টো করতে হবে!!একেবারে অস্কার উইনিং অ্যাক্টিং!!""আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। চারটে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে পড়েছিল, মনে হয়েছিল একটাকে একজায়গায় আনতে এক হপ্তা লাগবে!কিন্তু, সেসব ভুল মালুম করিয়ে সে ঈশ্বরের জীব, পা গুলোকে ঠিক জায়গায় নিয়ে এসে, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলো!!সে যে কি দৌড়! যেন রানা প্রতাপের চেতক!সোনার কেল্লার উটেরা তার কাছে তুচ্ছ।।

সেই ভ্যাবলা ভাইপো, -"সাসা, অ সাসা, পাইলে গ্যাল যে,"বলে চিল্লানি জুড়লো, আর কাকা বেচারা, হালকা হওয়ার মাঝরাস্তা থেকে উঠতে না পেরে, "ওরে ফোক্কড়, ধর না ক্যানে, ছোট না ক্যানে , দাঁইড়ে আচে দ্যাকো!"বলে ধমক দিতে লাগলো।

-"সে উট আর পাওয়া গেল না বুঝলি।সে তখন গায়েব!" দীপকদা গল্পের এন্ডিং এ পৌঁছে ব্যাখ্যা দিল, -"এবার বল দেখি, আমাদের ছকবাজ পাড়ার কেমন মাহাত্ম্য!!জবাই হবে বলে যে উট সেই সুদূর মরুভূমি থেকে ট্রাকে চেপে, পায়ে হেঁটে এদ্দূর এলো, কোথাও রা কাড়লো না, প্রতিবাদের একটা বুলি বললো না,এই ভট্টাচার্য পাড়াতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বুদ্ধি

তোমাদের ওখানে আজকাল পেয়ারার সঙ্গে সঙ্গে মেন্টসের ও ফলন মারাত্মক!!

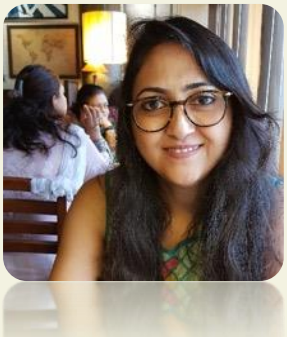

BARNALI MUKHERJEE is a Masters in Bengali Literature from Jadavpur University, Kolkata. Her specialization is linguistics and her passion poetry. She herself is an avid reader and prolific writer of Bengali poetry and stories. She also is an elocutionist and loves to recite poetry. Some of her works have been published in DESH magazine of Ananda Bazar Patrika and others have found place in other renowned Bengali magazines across the country.

TISTA BANDYOPADHYAY
Grade 6
Vidya Valley School

MY LITTLE TEACHERS

Dr. Abhimanyu Sengupta

Having spent the better part of 3 decades amidst kids on account of my profession, these little friends of mine have never failed to fill me with a sense of marvel and wonder at every step along the way. They manage to say the first thing that comes to their minds, social niceties and appropriateness be damned! - pronouncements that are spontaneous and straight from the heart, not distorted by the lens of wisdom and experience. Pronouncements that sound outrageously funny but punch you in the gut with their keen understanding as realization sets in. This is because communication comes naturally to children, their lifeline to the world around them as they know it, from the time they open their eyes to the world, and possibly, even before that. This is a gift we can ill afford to take for granted, because if it does not get the recognition or appreciation it deserves, it will simply be withdrawn.

We adults, as parents and caregivers, often get so caught up with the presumption of both the infallibility of our sense of judgment and their naivete, so engrossed in trying to figure out better and better ways and things we can teach them, that we often overlook a supreme truth – the lessons that we can learn from them.

I have received some of the most significant lessons of my life from them. Lessons that have helped me evolve as a person.

Children hold a mirror to our feelings, giving us the ability to laugh at ourselves. They endow us with a vision that is uncluttered, unfettered by the baggage of preconceived notions that we have created for ourselves, bit by bit.

They teach us that it is alright to not always be the best in what you do; it is alright to brush your failures off and move on, for life is an inexhaustible treasure trove with so many more wondrous experiences to explore and enjoy, providing a fascinating array of options to choose from, if and only if we can let go of stereotyped patterns reinforced by dead habit. For them, courage does not necessarily mean getting it right every time. It is as important for us as adults to retain the vulnerability of childhood that we have chosen to erase from our 'grownup' mindsets, so that we can ask questions for which we have no answers.

Children have the natural ability to try new things out, born out of an innate sense of curiosity, a faculty that we have lost in the business of trying to work our way through the busy 'to do' lists of our daily lives. They teach us that 'routine' may be comfortable but experimentation is fascinating. It is from our kids that we learn that there's always more than one way to do things, that life need not be a desperate effort to play by the rules. There is as much fun in playing the game as there is to its outcome.

Children trust instinctively and implicitly. This gives them an intuitive sense of perception of others' feelings. Trust begets trust, so if you trust your kids and teach them to trust themselves, they are not afraid to express themselves, thus helping build a stockpile of self-esteem, which will stand them in good stead

through their lives. In return, they unknowingly help us appreciate in fuller measure the true meaning of forgiveness - by forgiving us our wrongdoings and transgressions - and in doing so, give us the greatest gift of all – the gift of unconditional love.

The bond that a child and his/ her paediatrician share is a special one. I have attempted, over the years of my professional life, to chronicle some of my most memorable interactions with my little teachers in the form of anecdotes. Here are some of my favorites:

You have the chatty kids, who love to share their experiences with someone outside of the family group, and you have the 'strong silent' types, who observe everything closely and intuitively, speaking only when spoken to, and sometimes, not at all – but when they do, it is most often something so profound that it leaves you fairly nonplussed. And then, of course, you have the 'angry young men' (and women) who early on in life decide that here is a villain not to be trusted (most often helped along by parents who only serve to reinforce this notion by adding their own colors to the picture). 6 year-old Dia belonged to the first category. She walked into my consulting room one evening. Her mother was the kind I place in the 'forever hassled' bracket and a veritable storehouse of complaints (some real, most imagined – though I wouldn't dare say that to her face). Today's litany was on how the little girl refused to eat what was packed in her lunch box at school and was, as a result (to the mother's mind at any rate), not putting on as much weight as she should, or rather, as much as some of her peers were (a fact I did not concur with, for the record). Papa remained a mute spectator, as always. Dia was unconcerned. But I could tell from the expression on her face that she was dying to tell me something, as she did on every visit; so, at considerable personal peril, I decided to cut the recital short with, "Hey Dia! What's new today?" In response, Dia, her mischievous eyes alight with merriment, came as close to me as she could - and giving her mother a sidelong glance, almost whispered in my ear (but loud enough for her parents to hear), "You know Uncle, Mommy is wearing Papa's tee shirt today!"

****

It was 9pm on a busy Saturday, the fag end of a hectic work week. Working my weary way down a long list, I had finally reached the last appointment for the day. I was stretching my upper back to relieve a cramp from sitting in my chair all evening when 4 year-old Ankur walked in with his parents, both looking equally weary. I started ticking the boxes in my mind. Both dressed formally. Working parents both, from the looks of it. Laptop bags and a Captain America knapsack. Probably just picked the kid up from daycare on the way back from work. "So what's happening with you, champ?", this after we had him settled down. Works most times with the 4 year-olds. Not this time though. Ankur sat staring sullenly at the pattern of tiles on the floor, as though trying to commit them to memory. Mum took over. "Nothing much really, doc. He says he's been feeling kind of weak since the past few days."

Weak? That's an unusual complaint for a 4 year-old to vocalize. Need to evaluate, my mental boxes alerted. I was scrolling down those boxes once more, ticking them one by one. "Is he eating well? Has he been falling ill frequently? Any cough/ cold/ fever/ sore throat/ tummy ache/

loose motions", I enquired in rapid fire response, almost like reading from a list, without making it sound so. Nada to all. Clinical examination normal. The staring match between Ankur and the floor continued. To the child, it was almost like I did not exist. I had to break the ice. "So Captain, you are feeling weak, are you? Now, tell me – how do we spell 'weak'?", I asked, laying a hand on his shoulder. He looked at me, a little taken aback. This was not the way it was meant to go. His little brows furrowed in concentration. He didn't know the answer for sure, I understood, but he was trying to work his way around possible alternatives. "W – E – E – K?", he offered in response, a little warily. I decided to change tack. I knew I had his attention at least. "Okay, never mind. Tell me, Ankur, what is the opposite of 'weak'?" I tried to help him along by making a show of flexing my muscles. I am not sure it registered though. For the little fellow's face suddenly lit up, breaking out into a huge grin. He knew the answer this time! "Weekend!", he shouted out with a victorious whoop, leaping down from the examination table and prancing excitedly around the room. "Weekend! Weekend! Mom and Dad will be at home!"

****

Chitra sat facing me on the examination table early one morning, looking very grave. She was all of 6. Poised, self-assured, articulate and composed as always. Making me feel like an oaf – as always. She didn't need her mother to tell me what ailed her. She had been vomiting since the night prior and was visibly distressed. I soon realized this was less from dehydration than from the fact that this was the first time in her conscious memory that she had experienced something of this kind, something that was beyond her bodily control. And this threw her completely and miserably out of gear. I tried to put her at ease as she lay down on the couch. Kids of that age often tend to be a little squeamish about having their abdomen examined. Chitra was no different, so to lighten the atmosphere, I tried to strike up a conversation, "So let me see dear, what can I feel in your tummy today?". This almost never fails to draw out a smile, even in the most tense of situations. This time it seemed to have the opposite effect however. For the look she gave me in response had me rooted to the spot, the look a particularly stern schoolteacher reserves for a particularly dense child in her class. She arched an eyebrow and with all the dignity she could muster, she said, "Vomit." She would have said more, if it hadn't offended her sense of propriety. But her expression said it anyway, in bold capitals and underlined for good measure, "What else do you expect?"

****

Melvin was visiting me with his dad. I do not remember what it was for. Not that it really matters. As I worked my way through the process of clinical examination, Dad sat on the sofa facing me, busy on his cellphone. Examination concluded, I sat down to write out a prescription and by sheer force of habit, began reading it out aloud as I did so, relaying necessary instructions, scarcely looking up. Dad was unfazed, still immersed in the intricacies of his digital appendage [not that I was paying him too much attention, I must confess]. This did not seem to go down too well with the little lad, as I soon realized. For, he stopped me midsentence with "Uncle, can you please stop for a bit?" and then, fixing a rather disapproving look on Dad, voice

dripping with sarcasm, added, “Dad, please keep your phone down. Can’t you see Doctor Uncle is saying something important?”

****

My 2 year old cousin, a good 10 years my junior, was being introduced to the concept of ‘my’ and ‘our’ with a lot of examples of stuff that he could identify with. And yet, the thing was preying on his mind I later realized because he seemed a little distracted as we played. The independent fellow wanted to figure this one out on his own. And then, all of a sudden, he stopped in his tracks and triumphantly declared, “Yes. I‘ve understood! It’s ‘my toothbrush’ but ‘our toothpaste’!” I couldn’t have got a deeper insight into the subject of ‘mine and ours’ than what that little boy taught me that day.

****

Our daughter, Eshna was participating in the first drawing competition of her life. It was a chaotic Ashtami morning at Govinda Gardens. At 2, she was the youngest in the ‘under 5 years’ category – and everyone’s darling to boot. Surrounded by a bunch of indulgent Dadas and Didis fussing over her. A blank sheet of paper was provided to her. She could draw whatever she wanted to, which didn’t amount to much, considering that she had not graduated beyond random squiggles. A fact she became acutely aware of as proceedings got underway. But that scarcely proved to be a deterrent, for the little girl took the sheet of paper from one Dada/ Didi to the next, flitting like a butterfly – getting one to draw a hill, another one a sun, one more a house and so on till she was satisfied with the result, adding a squiggle of smoke emerging from the house with a flourish as a finishing touch for good measure. She was the first to submit her entry – and the first to collect her prize as well. She had learned an important lesson fairly early on in life. That it is okay to delegate responsibilities and outsource your work to an external agency if you lack the technical expertise to execute it to your satisfaction. As long as you are in the clear, retain controlling interest of your enterprise and do not relinquish your intellectual property rights. As for payback, that’s a lesson for another day, to be learned when we get there!

****

Children observe – and absorb much more than we give them credit for, and use the knowledge they have gained in the process to advantage when you least expect them to, but that surprises you with its keen insight. Add to this the fact that today’s children have technology readily available at their fingertips and figure out at a fairly early age to harness it to shape the learning process. They let us know, albeit in their own inimitable fashion, that they are constantly assessing us and measuring both our actions and responses in social situations without being judgmental, for they do not have to carry the payload of a lifetime of biases and prejudices that we as adults do. And this makes our responsibility as caregivers all the more consequential and far reaching in its importance. We need to create a secure environment where they can dance and play, trust and express themselves, make mistakes and learn from them and just be who they are. For childhood visits us but once in a lifetime.

A paediatrician by profession, in consulting practice since 1991, Dr. ABHIMANYU SENGUPTA dons many hats. A trained classical musician, writer, painter, teacher, avid reader and fitness enthusiast, Abhimanyu has made a significant contribution in his professional capacity to issues related to adoption and children's rights. He is passionate about drama and apart from performing on stage, directs and scripts plays.

He has been at the forefront of theatrical activities at PPBP and has keen interest in various aspects of theatrical arts with particular focus on drama therapy.

TISTA BANDYOPADHYAY

MAYUR GUPTA

Entrepreneur by occupation, this is Mayur's new found passion in the lockdown period. He spends more than 4 hours finishing each of his artwork. Patience & the love for art reflect in his drawings.

ছোঁয়াচ

চন্দ্রচূড় দত্ত

স্টেজের উপর আলোর বৃত্তেরা নেচে বেড়াচ্ছে। সোজা পড়লে এত আলো যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সাউন্ড সিস্টেমে বাজছে কোমরে দোলা লাগানো ভিনদেশি সুর। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে কথা বলে দোলা।

ইস! এই বয়সে এই সব মানায়?

কি বলছিস? অহনা আওয়াজে শুনতে পায়না।

বলছি এখন আর এসব ভালো লাগে? দোলার হাত এখন মুখের কাছে।

কেন লাগবে না? অহনা হাসে। কদ্দিন পরে সেজেগুজে স্টেজে উঠবো। তোকেও তো কি সুন্দর লাগছে। দোলার চিবুক ধরে আদর করে দেয় অহনা।

তাই বলে ফ্যাশন শো?

দোলার অনুযোগ চাপা দিতে অহনা দোলার কানের কাছে মুখ নিয়ে আসে - এতো বুড়িয়ে গেছিস কেন? এই সব চার পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চাদের পড়াস বলেই কি প্রফেসর মার্কা হয়ে যেতে হবে? আমার মত সাত/আট বছর হয়ে গেলে কি করবি?

দোলা হাসে, কিন্তু চিন্তাটা একবারে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। বাজনা কমে আসে। কুচোদের নাচ শেষ হয়। মাইক নিয়ে পরবর্তী অনুষ্ঠানের কথা জানাতে স্টেজে ঢুকতে ঢুকতে অনুরাধা দোলার বাহুতে আলতো চাপ দিয়ে যায়।

কি হল? নার্ভাস নাকি?!

দোলা উত্তর দেওয়ার আগেই 'ওয়াও!! লেটস্ গিভ দেম অ বিগ হ্যান্ড (Wow!! let's give them a big hand) বলে স্টেজে ঢুকে পড়ে। দর্শকদের হাততালি অব্যাহত। দর্শক তো বেশিরভাগ বাবা-মা'রাই। বাচ্চারা ভালো করলে গর্ব হওয়াই স্বাভাবিক।

শহরের অন্যতম সেরা এই স্কুল সব অভিভাবকদেরই প্রথম পছন্দ। যদিও দোলার শিক্ষকতার দৌড় প্রাথমিকের আগেই শেষ, তাও এখানে কাজ করার স্ট্যাটাস আলাদা। তাই দোলা যখন চাকরিটা পেল, প্রায় তিনবার তাকে আলাদা আলাদা করে বন্ধুবান্ধব, পরিজনদের খাওয়াতে হয়েছে। তারপর প্রায় তিনবছর কেটে গেছে। আরো অনেকে এর মধ্যে চাকরিতে ঢুকলেও দোলা এখনো বয়সে সবথেকে ছোটদের দলেই পড়ে। দোলার স্বভাবটা খুব মিষ্টি। তাই ওকে ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবক সবাইই খুব ভালোবাসে। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম তো এদিক ওদিকে বলেই দেন যে দোলা হচ্ছে সবার সেরা। কারো কারো গাত্রদাহ হলেও সহকর্মীরাও সবাই দোলার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখে। প্রিন্সিপালের পেয়ারের লোক বলে কথা।

সব মিলিয়ে ভালোই। ভালো স্কুলে যেমন হয়, এখানেও স্কুল থেকে খুব ভালো যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সুবিধে হয় বলে অনেক কর্মীরাও বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের স্কুলবাসে আসেন। এতে সব পক্ষই খুশি। বিশেষ করে অভিভাবকরা শুধু মাসীদের হাতে বাচ্চাদের

ছেড়ে দিতে হচ্ছে না বলে আলাদা ভরসা পান। যদিও এখানকার যা ধরন ধারণ, বেশিরভাগ অভিভাবক শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও ওই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের মতই ভাবেন। সত্যি কথা বলতে কি দোলার কখনো কখনো মনে হয় যে এইসব বাড়িতে যে পরিচারিকাদের কাছে বাচ্চারা থাকে তারাও হয়তো দোলাদের থেকে অনেক বেশি মাইনে পায়। তবে এই নিয়ে দোলার যে কোনো অভিযোগ আছে তা নয়।

স্কুলের বাস, তাই সব ক্লাসের বাচ্চারাই তাতে আসে, যায়। সবাই যে দোলাকে চেনে তা নয়, কিন্তু যারা চেনে তারা বাসে উঠেই একটু টেনে, সুরে 'গুড মর্নিং মিস' (Good morning Miss) বলে ওঠে। কেউ কেউ আবার উঠেই কে মিসের পাশে বসবে সেই নিয়ে অনুযোগ করে। অন্যদের সামনে আলাদা করে এই গুরুত্ব পেতে প্রথম প্রথম তার খুব বাধতো। শুনে অহনা বলেছিল - তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি! বাচ্চারা কাকে ভালোবাসবে, কাকে বেশি গুরুত্ব দেবে সে নিয়ে তুই ভাবছিস? একটু বড় হলে আর চিনতেই পারেনা, করিডরের অন্যদিক দিয়ে হেঁটে চলে যায়। পাচ্ছিস তো, ভালো লাগবে কেন?

দোলার খারাপ লাগেনা। কিন্তু তার মনে হয় দেখতে ভালো বলে আলাদা আদর পাওয়া একজন শিক্ষিকার অপমান। যত দিন গেছে বাচ্চাদের এই ব্যবহার গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন দোলা রোজ আলাদা আলাদা বাচ্চার সঙ্গে বসে যাতে কোন একজনকে পক্ষপাতের অভিযোগের জায়গাটা না থাকে। তাই সেদিন যখন একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত বাচ্চা ওর পাশে বসতে চাইলো, দোলা 'হাই' বলে তাকে পাশে বসিয়েছিল।

কি নাম তোমার?

রাকেশ।

তোমার নাম মিস দোলা, না?

হুম। তুমি কি করে জানলে?

আমি সিনিয়র কেজিতে ছিলাম যেদিন প্রিন্সিপাল ম্যাম তোমাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ভাবলেশহীন উত্তর দেয় রাকেশ।

ওহ। বলে দোলা চুপ করে যায়। আর কি বলা যায় ঠিক চট করে মাথায় আসেনা। যাদের সে পড়ায়, তাদের সঙ্গে অনেক রকম কথা বলা যায়। কিন্তু রাকেশের সঙ্গে কি বলবে ঠিক ভেবে পায়না। হঠাৎ দোলার অস্বস্তি হয়। সব মেয়েরা কি বুঝতে পারে যখন তাদের কেউ নোংরা চোখে দেখে! দোলা পারে। হাত আপনিই আঁচলের অবস্থান পরীক্ষা করে। সব ঠিক আছে, তাও অস্বস্তি যায় না। আড়চোখে এদিক-ওদিক দেখেও দোলা অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পায়না। কেউ একদৃষ্টে চেয়ে নেই তার বুক, উন্মুক্ত গলা বা শাড়ির কুঁচির দিকে। দোলার গলা বুজে আসে। ভয়ে।

ভয়টা দোলার বুকে চেপে বসে আছে আজ অনেকদিন। এই স্কুলের আগে সে একটা প্রাইভেট ফার্মে কিছুদিন ছিল। দোলা সিনিয়র ম্যানেজার রেড্ডিসাহেবের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে প্রথম কাজ শুরু করেছিল। একটু বকাঝকা খেলেও কাজ শেখার অঙ্গ হিসেবে সেটাকে কখনো গায়ে মাখেনি।

মাসচারেকের মেয়াদ শেষ করে রেড্ডিসাহেব যেদিন অবসর নিলেন, হালকা করে চোখে জল এসে গেছিল দোলার। দিন দশেকের মধ্যেই রেড্ডিসাহেবের জায়গায় এলেন বিশওয়াস। হেমন্ত বিশ্বাস। কিন্তু হাবভাবে এমন সাহেবিয়ানা যে না বলে দিলে বাঙালি বলে বিশ্বাস হয় না। দোলার সঙ্গে প্রথম থেকেই বেশ একটা সহজ সম্পর্ক গড়ে নিলেন বিশওয়াস সাহেব। অন্ততঃ দোলার তাই মনে হয়েছিল যতদিন না সাহেব দোলার পাশে দাঁড়িয়ে নোট দেওয়ার সময় দোলার সেই অস্বস্তিটা হয়েছিল। তার মনে হচ্ছিল বিশওয়াস সাহেব চেয়ারের পেছনে হাত রেখে আলতো করে তার অন্তর্বাসের হুকের আশেপাশে আঙ্গুল ছোঁয়াবেন কিনা ভাবছেন আর মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আঁচলের তলায় তার বুকের দিকে। মিনিটখানেক না ঘন্টাখানেক মনে পড়ে না। বিশওয়াস চুপ করে ছিলেন, দোলার হাত ল্যাপটপের কিবোর্ডের উপর যেন কেউ সেঁটে দিয়েছিল, গলা শুকনো, চোখের পাতা পড়ছে না, দম বন্ধ। যেন শিকারি বাঘের ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষায় চোখে চোখ রাখা - নজর সরলেই থাবা নেমে আসবে। ভাগ্যিস ঠিক তখনই বেয়ারা চা দিতে ঢুকেছিল।

ফ্যাশন শোয়ের ঘোষণা করেছে অনুরাধা। স্টেজে হালকা নীল আলোর মধ্যে চলছে বিদেশী সুর। প্রথম জুটি হিসেবে স্টেজে ঢুকে শেষপ্রান্ত অব্দি হেঁটে ফিরছে অহনা আর অঙ্কের আদিত্যদা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে, দর্শকের দিকে শরীর ঘুরিয়ে ফিরে শাড়ির আঁচল টেনে ধরে অহনা। হাততালি। এবার বিদেশী সুরে মেশে জনপ্রিয় হিন্দি গানের সুর। অহনা আর আদিত্য একটু কোমর দোলায়। একটু হাতের ভঙ্গিমা করে। ঠিক নাচ নাচ নয়, ওই একটু মজা করা আর কি! আবার সুর বদল। অহনা আর আদিত্য ফিরে আসে। এবার দোলা আর রজতের পালা। দোলা স্টেজে ঢুকে সামনে অব্দি হেঁটে আসে। দুজনে দুজনের দিকে হাসিমুখে তাকায়। দোলা একটু কোমর ভেঙে দাঁড়ায়। দোলার মনে পড়ে অনুরাধাদির ট্রেনিং - 'হাসিই আসল সৌন্দর্য দোলা। হাসি মানে কনফিডেন্স। হাসি যেন কম না পড়ে।' কিন্তু দোলা হাসতে পারেনা। সেই ভয়টা হঠাৎ তার বুকে দুরদুর করে ওঠে। কেউ দেখছে তাকে। অনুরাধার শেখানো হাসি, মাথার পাখির পালক লাগানো লম্বা টুপি, পোড়ামাটির কণ্ঠহার, পায়ের পাতা ঢাকা লম্বা পশ্চিমী পোশাক এই ধর্ষকামকে আটকাতে পারেনি। দোলার চোখ ঝলমলে আলো পেরিয়ে দর্শকদের মধ্যে খুঁজতে থাকে। নাচের তাল মেলে না, রজত বোকা বোকা অভিনয় করে। ঠিক ফিরে যাওয়ার আগে দোলা কোণের দিকে বসা লোকটাকে দেখতে পায়। ও। ওই। দোলা উইংসের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ার আগেই ঠিক করে নেয় আজ সন্ধে ফুরানোর আগেই এই লোকটাকে একটা কষিয়ে চড় মারবে। তাতে চাকরি যায় যাক।

অনুষ্ঠান শেষ হয়। ড্রেসিংরুমে অনুরাধা সবার সামনে দোলাকে বলেই ফেলল - এটা তুমি কি করলে দোলা? এমন সুন্দর একটা শো, এভাবে ডোবালে?

দোলার কানে কোন কথা ঢোকে না। সে চটপট অতিরিক্ত সাজপোশাক খুলে ফেলে। মুখটা ধুয়ে

জবরজং মেকআপ তুলে ফেলে। তারপর সোজা বাইরে বেরিয়ে যায়। বাইরে লনে কার্নিভালের আলোয় ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে বাচ্চারা। অভিভাবকরা তাদের সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। নানারকম খেলা ধুলো, খাবারের স্টল, মাইকের সুর, বাচ্চাদের হাসির শব্দ দোলাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। কোথায় খুঁজবে শয়তানটাকে এর মধ্যে?

দোলার ভীষণ অস্থির লাগে। ভেতরটা রাগে ফেটে পড়তে চায়। মনে হয় চিৎকার করে ওঠে। সেদিন বাসের ওই ব্যাপারটার পরেও মনে হয়েছিল সোজা গিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে অভিযোগ করার কথা। মনে হয়েছিল মুখোশ খুলে অপরাধীর আসল পরিচয়টা সব্বার কাছে স্পষ্ট করে দেওয়ার কথা। বাস থেকে নামার পরে সোজা প্রিন্সিপ্যালের ঘরের দিকেই যাচ্ছিল। কি বলবে, কিভাবে বলবে এসব ভাবতে ভাবতেই কে যেন ডাকলো পেছন থেকে।

হেল্লো দোলা! কেমন আছো? প্রশ্নকর্তা হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন করমর্দনের জন্য।

"হাসি মানে কনফিডেন্স।"

ও হাই মিস্টার বিশওয়াস! আপনি এখানে?

আমি? আমি এই সক্কলের মত - একজন অভিভাবক। মাই সন ইজ ইন ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড (My Son is in fourth standard)। তুমি বোধ হয় চিনবে না।

"হাসি যেন কম না পড়ে।"

আপনি কেমন আছেন স্যার?

ভালো আছি দোলা। এ্যান্ড আই মাস্ট এডমিট, ইউ লুকড্ র‍্যভিশিং অন দ্য র‍্যাম্প টুডে দোলা। অ্যবসল্যুটলি র‍্যভিশিং। (And I must admit, you looked ravishing on the ramp today Dola. Absolutely Ravishing.)

শেষ কথাটা বিশওয়াস বলেন প্রায় ফিসফিস করে। হাতে কি একটু চাপ অনুভব করলো দোলা? তখনই খেয়াল হল কি অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় তার হাতটা ধরে রেখেছে শয়তানটা।

সেদিন বাসে যখন ভয়টা জড়িয়ে ধরেছিল তখন রাকেশের হাত থেকে পেন্সিল না কি একটা যেন নিচে বাসের মেঝেতে পড়ে গেছিল। অস্বস্তি কাটিয়ে সেটা খুঁজতে গিয়ে দোলার মনে হল যেন দেখতে পেল...!! সামনের সিটের তলায় কিছু পড়ে আছে কি? মনে হয় দেখতে পেয়ে রাকেশও সিটের ফাঁকে উবু হয়ে বসে পড়েছিল আর হাত বাড়িয়ে ওটা ওঠানোর চেষ্টা করছিল। চলন্ত বাসে ব্যালান্স রাখা মুশকিল, রাকেশ তাই বাঁ হাতে ধরেছিল দোলাকে। দোলাও মাথা নিচু করে দেখার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ দোলার দিকে ফিরে, দোলার মুখের খুব কাছ থেকে রাকেশ প্রায় একই রকম ভাবে ফিসফিস করে বলেছিল 'মিস!'। চমকে তাকাতেই দোলা অনুভব করেছিল রাকেশের বাঁ হাতটা অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় ধরে তার পায়ের উপর রাখা আছে। দোলার উরুতে একটু চাপ দিয়ে রাকেশ ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'মিস ইউ আর বি-উ-টি-ফুল!' (Miss! You are b-eau-ti-ful!)

CHANDRACHUR DATTA

নরেন্দ্রপুরের প্রাক্তন ছাত্র চন্দ্রচূড়ের নেশা নাটক ও বাংলা লেখালেখি। পড়াশুনা আর চাকরি - বেশীর ভাগ সময় প্রবাসে কাটানোয় প্রচুর মানুষকে চেনার, কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়; লেখালিখির কাঁচামালের যোগান আসে সেখান থেকেই।

Adwitiyaa Dhar
Std IV
Indira National School

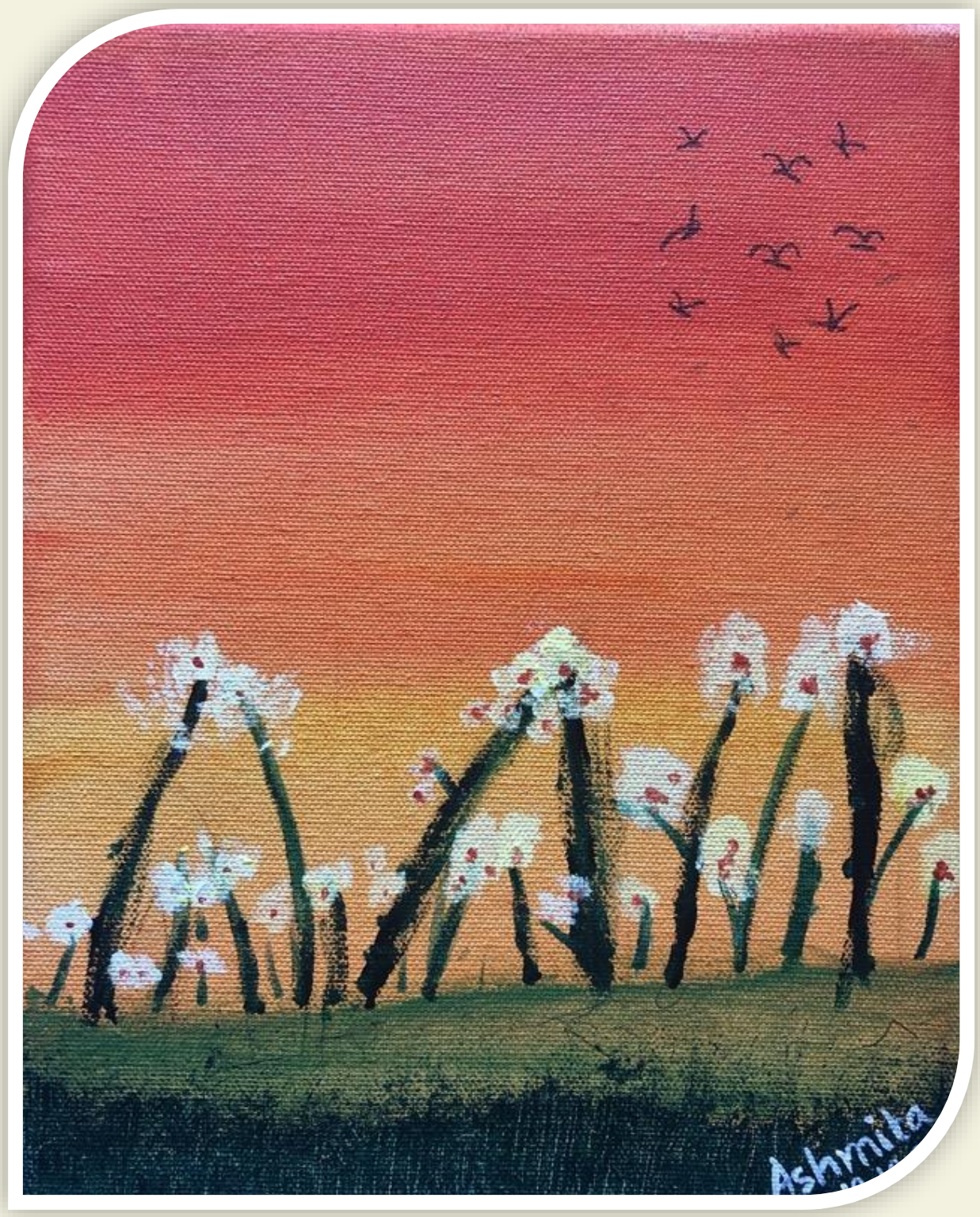

ASHMITA BANERJEE
Class II
Greensboro Academy, North Carolina, USA

TOMORROW MAYBE

Swati Mookherjee

Mother Earth, the only home known to harbour life,
A tiny spec in the entire cosmos, but a whole wide world
for creation to flourish amid strife;
The rustic beauty of your untouched virgin land is unprecedented,
A dream is born here every minute to live through its cycle from life till death;
An abode for flora and fauna to coexist in harmony,
You are witness to the rise and fall of civilizations so many.

Oh Mother, time and again you have endured frightening destruction -
man-made and natural,
Hurt and bruised, you continued through your journey eternal;
Invincible, you have showered us with your bountiful kindness,
Each day here narrates stories of miracles countless;
We have seen your love, we have seen your fury,
But we know post despair there is hope and happiness will
follow after misery.

Dear Mother Earth,
May the sun rise tomorrow with the promise of a better future,
May evil be eclipsed by goodness and tears with laughter;
May your humans evolve to be more humane and
cheer be spread by the rainbow after rain;
May love conquer hatred and
May there be lesser sufferings across your length and
breadth;
May you keep circling around your sun in the galaxy and
May we minuscule beings surrender to your greatness
till eternity...

SWATI MOOKHERJEE

Hello everyone... this is my humble attempt to put all my jumbled thoughts into a poem (if I may call it so). Hope you enjoy reading it. Apart from writing I also like doing up interiors.

স্বর্গ ভ্রমণ

শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়

আমি তখন একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপানোর জন্যে ভাবলাম একটি কিছু লিখি। লেখা হল একটি ছড়া - স্বর্গ ভ্রমণ। এটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, পুরাণভিত্তিক নয়। এ ছড়া স্কুল ম্যাগাজিনে দিতে গিয়েও দেওয়া হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে, এই ছড়া তালবাদ্যসহযোগে আবৃত্তি করে অনেকের মনোরঞ্জন করেছি।

আজকে হঠাৎ বন্ধু এলো,
স্বর্গ যাবার কথা উঠলো।
গত বছর এমনি দিনে,
গিয়েছিলেম স্বর্গ ধামে।
একি? কাঁপলি কেন কথা শুনে
ভয় পেয়েছিস মনে মনে?
ভয় কোর না সত্যি কথা।
স্বর্গে যাবার অভিজ্ঞতা।

স্বর্গধামের কপাল ভালো।
দেবরাজ হেডমাস্টার হল।
মা দুর্গা লজিক পড়ান।
শিব কিন্তু সেই পথে যান।
কার্ত্তিক ঠাকুর অঙ্ক কষায়।
ভ্রমর বসে গোঁফের আগায়।
গণেশ দাদা ভাবুক কবি।
ভাঙ্গা চকেও আঁকেন ছবি!
দেবশিশু সব পড়ে বিজ্ঞান।
কুবের তাদের সবই শেখান।

বাসস্থান আর খাদ্যখাবার -
ব্যবস্থাটা বড্ড মজার
বিষ্ণু - নারদ - সরস্বতী
আঁশ খান না - নিরামিষী।
খাবার নিয়ম দুর্গা করেন।
অন্য জনা হিংসা করেন।
মা লক্ষ্মী সুপারেনটেন।
পোস্তবড়া রোজ খেতে দেন।
বৈকুণ্ঠের শ্রী নারায়ণ।
পেটের রোগে সদাই শয়ন।
সূয্যি ঠাকুর পায়ের ব্যথায়।
সারা বেলা হেঁটেই কাটায়।
নারদ বলে,"মানুষ ভাই
গত পরশু মর্ত্যে যাই।
তারপর দিন ফিরে আসি।
হয়েছে বেজায় সর্দি কাশি।"

বন্ধু বলে, "বলিস কিরে!
দেখলি কখন ঘুরে ঘুরে?"
"বলছি আমি। বিশ্বাস কর।
যা দেখেছি শুনে যা ঘর।"
দেখার সময় কেউ ছিল না।

ছিলেন কেবল সন্তোষী মা।
সন্তোষী মা সবজান্তা।
সব কথাতেই নাড়ান মাথা।
তারপরেতে কি দেখেছি?
একটু দাঁড়া। সব বলছি।

শ্যামসুন্দর কাটলো ছড়া।
স্বর্গভ্রমণ - মনের গড়া।

হতভাগ্য ঈশ্বর

আমি সামান্যই কিছু কবিতা লিখেছি। তার মধ্যে এই 'হতভাগ্য ঈশ্বর' কবিতাখানি ব্যক্তিগতভাবে আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মনে হয়। কলেজে পড়ার সময় লেখা এই কবিতাটি মানুষ এবং দেবতা এদের মধ্যে কে সুখী তারই একটি প্রতিবেদন।

দামোদরে বাঁধ বেঁধেছে।
বাঁধে জল নেই -
বালুগর্ভ দামোদর।

ঈশ্বর তোমাকে বিসর্জন দিলাম
দামোদরের বালুতে।
হে পৈতৃক শিলাসন গৃহদেবতা -
চন্দন, কস্তুরী, পুষ্প, দীপ-ধূপ, বাস
ঐশ্বর্যের লীলা তোমার শেষ হল।

পথচিহ্নহীন মরুভূমির -
বালুস্তূপের দিশাহারা তৃষাভূমিতে -
ঈশ্বর! এবার চিৎকার কর।
বল, জল দাও -
জল দাও।

আমার মৃত্যুর শান্তি আছে।
দুঃখেও স্বপ্ন আছে।

কিন্তু হতভাগ্য ঈশ্বর!
তোমার সম্বল -
মৃত্যুহীন জীবন! তৃপ্তিহীন অপার তৃষ্ণা!
এবং স্বপ্নহীন চোখ।।

SAMVIDHA BANERJEE
Age: 7years
Class 2A
Euroschool West Campus Pune

DR. ABHIMANYU SENGUPTA

The Puranic fable of Dhruva is one of my favourites. At one level, it represents the victory of the underdog. A t another, it signifies the attribute of remaining steadfast and focused on one's goals, a virtue we all desire but often spend a lifetime in trying to reach.

THE ROLE

Dibyangana Saha

"Mumma, can you prepare street style chowmein?" inquired 10-year-old Dhruv to his mother. He had just returned from his friend's place after working on a Science project together.

"Why, my aloo parathas are not tasty enough for you?" replied Neena playfully, to her son.

"Well Rishi treated me to home-made street-style chowmein today and it was simply scrumplicious." Dhruv grinned with joy. As she looked at her exuberant son, Neena realised that he must have really enjoyed it since he rarely used the word' scrumplicious, which he had invented himself to describe food he found extremely tasty: a mixture of delicious and scrumptious.

Rishi had shifted base to their city, at the beginning of that academic year and joined Dhruv's school in the 5th standard. Over a very short span of time Dhruv and Rishi had grown extremely fond of each other. From Dhruv's accounts of Rishi, he seemed to be an extremely talented, intelligent and insightful young man. Not only he excelled in academics, but he was jolly well in extracurricular activities as well.

"If you liked it so much then why didn't you ask his mother about this amazing chowmein recipe? I could have tried my hand at preparing it as well!" replied Neena.

Dhruv rolled his eyes in exasperation and said, "His mother was not home. Lakshmi aunty, who takes care of him when his parents are away at work served us. I don't even know who prepared the chowmein, Lakshmi Aunty herself or his Mom! And anyways Mumma, Rishi and I hardly discuss recipes. We are too busy discussing about superheroes, sports, cars and sports cars you know? The things that are really important."

"But you know what's really funny?" Dhruv continued after putting his shoes in the shoe rack.

"What's that?" replied Neena.

"We went to the storeroom to get some stuff for our project and I discovered a giant kitchen set there!"

"Really?"

"Yeah! Rishi said he loved playing with it when he was little! Can you believe it? A boy playing with a kitchen set. I teased him so hard about it!" Dhruv guffawed away.

"What is so wrong with Rishi owning a kitchen set?"

"But Mumma! Boys play with cars and guns and girls play with barbies and kitchen sets, right? Everyone knows that." Dhruv stated the obvious and went to the washroom.

A boy playing with a kitchen set. Is that idea really so ludicrous? Neena thought. Had Ninaad, Dhruv's father played with more kitchen sets than Carrom boards in his childhood, it would have been a blessing for her. Contribution in the housework is something she would have gladly welcomed. Since the day she decided to voluntarily take a break from her career, Neena, armed with a master's degree in Zoology, oscillated between trying to make round aloo parathas and raising the perfect son! It was, as if, by the

power vested in her by some invisible decree, the onus of maintaining a fully functioning household was solely upon her, with barely any help from Ninaad. With great power comes great responsibility, they say. Indeed!

"Well now that the midterm exams have just got over, can Rishi come for a sleepover this Saturday, Mumma?" Neena's mind scrambled back to reality with Dhruv's next question.

"His father has some plans for this weekend with his friends and it would have been great if he could spend the night at our place," Dhruv explained.

"I guess that's ok. Now enough chit chat! Scoot off and finish your schoolwork", Neena reprimanded Dhruv sternly. Dhruv jubilantly went off to finish his homework.

Neena was really impressed with Rishi's parents' gesture of buying him that kitchen set. She was very keen to meet them, especially his mother. Very often Neena marvelled at Rishi's mother's parenting skills. Well some women are just superwomen, she had concluded. She had a full-time career, managed her home beautifully and had a keen eye for detail towards Rishi's schoolwork and other extracurricular activities.

Neena could barely contain her excitement as this sleepover posed a wonderful opportunity of meeting Rishi's mother. Since his father was busy with his own plans, it was obvious that it would be Rishi's mother, who would come to drop him over that weekend for the sleepover. She would be able to have a good heart to heart with the lady she had been admiring from afar for the past few months.

Saturday, sharp at 6, Rishi arrived at their home. "Hello Aunty!" he greeted Neena. Neena quickly greeted the boy and rushed outside to invite his mother inside. She saw a man, climbing back into the driver's seat. "Hello!" Neena called out.

"Hello! I am Madhur, Rishi's father. So nice of you to have him over for a sleepover," he greeted Neena.

"Oh, that's ok. I am Neena. The boys deserve some fun after the days of hard work. I think Dhruv told me you were a bit busy over this weekend."

"That's true Neena. I do have some plans with my friends tonight and it was great I could drop off Rishi here for the night! Rishi really enjoys spending time with Dhruv!"

"Actually, I was hoping that his mother would accompany Rishi and I would get to meet her as well," blabbered away Neena, desperately trying to mask her disappointment.

"Oh, Disha is not currently here at all. She is away in London, on an official assignment for about a year. Another 6 months' and she would be back. I will surely introduce you guys when she is back!" Madhur smiled at Neena.

Neena, stood there, dumbstruck, staring at Madhur. She was staring at the organised, meticulous, multifaceted caregiver of Rishi, the 'wonder mother' whom she had been idolising secretly and planning to become best friends with for so many days. She was staring back at the man who had probably encouraged Rishi to buy that kitchen set when he was a toddler. She gaped in awe, at this parent and husband, whose encouragement had enabled Rishi's mother to pursue her career, away from her son and her so called 'duties'. He had vested in her with the power to pursue her dreams and had completely relieved her of the responsibility of running 'their'

establishment and raising ‘their’ perfect son!

As Madhur started walking back to his car, Neena cried,” Hey Madhur!! Care to join me for some tea?”

“Yes, I could, at the risk of irking my friends on being late for the meetup. So, next time, maybe?”

“I would love to get that street style chowmein recipe from you someday.”

“Sure! But I will not give away my secret ingredient,” Madhur replied coyly.

The ‘parents’ beamed at each other with joy.

DIBYANGANA is a Risk Consultant by profession and a mother to a rockstar. She has realized that dynamic prioritization and de-prioritization between work and family is the key to a happy life. She belongs to a family which firmly believes that women are in no way equal to men, but are far superior.

SWASTIK CHATTOPADHYAY
Class – Senior KG
Pathshala, Baner

ঘড়ি

ঊষসী রায় চৌধুরী

আট বছর বয়সে আমার মা আমাকে সত্যজিৎ রায়ের ফ্রিতজ গল্পটা শুনিয়েছিল । গল্পটা একটা পুতুল-ভূত কে নিয়ে। সেটাই ছিল ভূতের গল্পের রাজ্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তারপর থেকে কতই না ভুতের গল্প পড়েছি। কতরকমের ভুতের সঙ্গে আলাপ করেছি!

গল্পে সাধারণত মৃত মানুষের আত্মা নিয়েই চর্চা করা হয়। অথচ আমি আরও নানারকম ভুতের কথা পড়েছই - জীবজন্তুর ভূত, পোকামাকড়ের ভূত, গাছপালা থেকে শুরু করে বই, ঘড়ি .. কত কি! আবার আর একটু জটিল জিনিসপত্র ও আছে, যেমন আয়নার কাঁচের পেছনে একটা আলাদা দুনিয়া (mirror world), কিম্বা ভয়ানক দৈত্য, যা ঠিক ভূত নয়, তবে কাল্পনিক জীবও নয় ।

আমি ঠিক বলতে পারবো না, ভৌতিক কাহিনী আমাকে এতো টানে কেন। বাড়িতে যখনই আনন্দমেলা বা কিশোর ভারতী এসে পৌঁছয়, প্রথমেই আমি খুঁজে খুঁজে ভূতের গল্পগুলো পড়ি। যত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভূতের সিনেমা আছে, তার বেশীর ভাগই আমার দেখা। আসলে বোধ হয় আমার - কি বলব - ভয় পেতে ভালো লাগে।

কিম্বা বলা উচিৎ, লাগতো।

****

একদিন বিকেলে আমি ঘুরতে গেছিলাম ইউনিভারসিটির গণিত বিভাগের পেছনদিকে । ওখানটা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, দেখি মাটিতে কি যেন চকচক করছে। ঝুঁকে দেখি একটা ঘড়ি। কিন্তু সে কি চমৎকার ঘড়ি! সাধারণত ডায়ালে যেখানে ১ থেকে ১২ অবধি সংখ্যা থাকে, সেখানে বারোটা অঙ্ক! ঘড়িটা ছিল এইরকম দেখতে।

ছোটবেলা থেকেই আমি অঙ্ক খুব পছন্দ করি। তাই জন্যেই , ঘড়িটা নিয়ে আমি বেশী খোঁজাখুঁজি করলাম না। না, না। আমাকে চোর ভাববেন না! দুদিন আমি ঘড়ি গণিত বিভাগের রিসেপশন এ রেখে দিলাম, যদি কারো হয় তাহলে নিয়ে যাবে। তৃতীয়দিন ওখানের লোকেরা আমাকে বলল - কেউ তো নিতে আসেনি। তবে এই ঘড়িটা তুমিই নিয়ে যাও।

আর আমিও ‘finders keepers’ বলতে বলতে ঘড়ি হাতে পরে রওনা দিলাম।

সেদিন রাতে আমি ঘড়ি হাতে পরেই ঘুম দিয়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি, আমার টেবিলে একটা অঙ্কের বই খোলা। এইটা খুব অসাধারণ ব্যাপার নয়। মানে, আমি বলতে চাইছি, এটা খুব অসাধারণ ব্যাপার হত না, তবে ঐ বইটা আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি, আর ওটা প্রচণ্ড কঠিন! দেখে মনে হচ্ছিল আমি অন্তত কলেজে যাওয়া অবধি ওগুলো পারব না।

বইটা হাতে নিয়ে নিচে নামলাম। মা জিজ্ঞেস করল ' ঐ বইটা কি রে? কোনও বন্ধু তোকে দিয়েছে? আর এত শক্ত বই নিয়ে তুই করছিসটা কি?'

'এটা তোমার কিম্বা বাবার নয়? কালকে আমার টেবিলে পেলাম। আমি তো ভাবলাম তোমরা রেখেছ ওখানে।' বইটা বাড়িয়ে দিই। বাবা দেখে বলল, 'না আমার তো না। তুই কেন এসব বই এখন ঘাঁটছিস?'

একটু বিরক্ত হলাম। আরে, বলছি তো আমি জানি না বইটা কোত্থেকে এসেছে!

তখন তো তাড়াতাড়িতে বইটা বাড়িতে রেখে স্কুলে চলে গেলাম। কিন্তু তবু কিরকম আজব মনে হচ্ছিল পুরো ব্যাপারটা , একটা কারণে। ঐ বইয়ের শক্ত শক্ত অঙ্কগুলো, যা আমার মোটেও পারা উচিৎ না, সেগুলো আমার কেন জানি জলের মত সোজা লাগছিল।

স্কুলে সেদিন অঙ্ক একেবারে লাস্ট পিরিয়ডে । স্যারের কাছে খাতা জমা করছিলাম। রোজ যেমন হয়, স্যার একসঙ্গে দুটো ক্লাসের খাতা দেখছিলেন। এক দিকে আমাদের খাতা, আর অন্যদিকে ক্লাস টুয়েলভের দাদা-দিদিদের খাতা। স্যার আস্তে-সুস্থে দেখছেন, আর আমি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হাতের ঘড়িটা নিয়ে খেলা করছি। এমন সময় দেখলাম ক্লাস টুয়েলভের একটা খাতা খোলা রয়েছে, তাতে একটা অঙ্ক কষা। দেখেই আমার মাথার মধ্যে যেন লাইটবাল্ব জ্বলে উঠল। অঙ্কটা মাথার মধ্যে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম .. আর এও দেখতে পেলাম যে তৃতীয় ধাপে ভুল হয়েছে। স্যার কে সেই কথাটা বলাতে তিনি বললেন 'কি বলছ কি? তুমি থোড়ি জানো এইসব অঙ্ক! বলো কি ভুল হয়েছে, এত যখন জানো!'

অঙ্কটার দিকে আর একবার তাকালাম। কিন্তু কোথায় কি, কিছু তো বুঝতে পারছি না! হঠাৎ কি হল! লজ্জায় মুখ লাল করে সীটে বসে পড়লাম। তখনই খেয়াল করি যে ঘড়িটা আর আমার হাতে নেই, পড়ে গেছে। ওটাকে তুলে নিলাম, দিয়ে আবার পরে নিলাম। মাথায় অঙ্কটা খেলাতে শুরু করলাম। বাহ, এখন তো আবার সুন্দর পারছি! তাহলে স্যারের সামনে মাথা ফাঁকা হয়ে গেল কেন? তার চেয়েও বড়ো কথা, ওইরকম অঙ্ক আমি শিখলাম কোথায়?

ভাবতে ভাবতে আবার ঘড়িটা হাত থেকে ফসকে পড়ে গেল। তেমনিই ম্যাজিক এর মতো মাথা ফাঁকা! কি করে যে অঙ্কটা কষব জানা নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল।

ঘড়িতে জাদু আছে। পরে যখন আছি, তখন আর কোনও অঙ্কই আমাকে আটকাতে পারছে না! অলৌকিক ব্যাপার!

বাড়ী ফিরে প্রথমেই আমি সেই জায়গাটায় ফিরে গেলাম, যেখানে আমি ঘড়িটা পেয়েছিলাম। ওটা পড়েছিল গণিত বিভাগের একটা জানালার নীচে। বিল্ডিং এ ঢুকে আমি ঐ ঘরটার দরজার সামনে দাঁড়ালাম, যার জানালার নিচে সেই ঘড়িটা পড়েছিল। দেখি কি, দরজা

মনে হল মাথার ওপর যেন বিরাট একটা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতো অঙ্ক, এমন অনুভব করছিলাম যেন কেউ আমার কানের কাছে ফিসফিস করে একের প্র এক অঙ্ক বলে চলেছে। মাথা ঝনঝন করে উঠল - আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। চোখের সামনে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

অনেক পরে একজন লোক আমাকে খুঁজে পায়, সেই ঘরে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায়। এদিকওদিক জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম যে ঘরটা ছিল গণিত বিভাগের এর একজন প্রফেসরের। তিনি নাকি কয়েক মাস আগে মারা গেছেন । এবং তাঁর একটা অঙ্ক, যার খোলা! দরজা ঠেলে আমি ভেতরে ঢুকলাম, ঘড়িটা তখনও আমার হাতে।

সেই ঘরের দেওয়াল জুড়ে অনেকরকম চার্ট, তার ওপর নানারকমের অঙ্ক কষা। আর সে কিরকম অঙ্ক, অর্ধেক চিহ্ন আমি আগে কখনো দেখিনি। মনে হচ্ছিল যেন কোন অন্য ভাষায়। তা ছাড়া মাটিতে প্রচুর বই ছড়ানো, খাতার পাতা এদিকওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে! (বলাই বাহুল্য, সবই অঙ্কে ভর্তি।)

এমন সময় হঠাৎ আমার পেছনে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। আলো জ্বালিয়েছিলাম ঘরে, সেগুলোও নিভে গেল। আর আমার চোখের সামনে রাশি রাশি সংখ্যা আর চিহ্ন ঘুরতে লাগল। মাথার মধ্যে অঙ্ক যেন ভন ভন করতে লাগল।
ওপর তিনি কাজ করছিলেন, সেইটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছিল। আমি যে হাত ঘড়িটা খুঁজে পেয়েছিলাম সেটা তাঁরই বানানো। নিশ্চয়ই সেই অঙ্কটাই সেদিন ওখানে আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।
সেই ঘটনার পর এক মাস কেটে গেছে। ঘড়িটা প্রথমে আমি ছুঁড়ে পুকুরে ফেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু কি করে যেন সেটা আবার আমার টেবিলের ওপরে এসে পৌঁছেছে। ওটাকে আমি আবার ফেলার চেষ্টা করেও ফেলতে পারলাম না। যাই করি না কেন, ওটা আবার আমার কাছেই চলে আসে। আজকাল ঘুম ও হয়না - বসে পাতার পর পাতা সেই আজব অঙ্কটা কষে চলেছি। আস্তে আস্তে বাইরের জগতের আর

কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না.. আছি শুধু আমি, আমার হাত ঘড়ি, আর একটা অঙ্ক, যার কোন শেষ নেই। ও হ্যাঁ, সেই বইটাও আজকাল কাজে লাগছে। মনে হয়, বইয়ের লেখক এবং ঘড়ির সৃষ্টিকর্তা একই লোক।

USHASI ROY CHOUDHURY
নবম শ্রেণী
কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, গণেশখিন্দ, পুণে

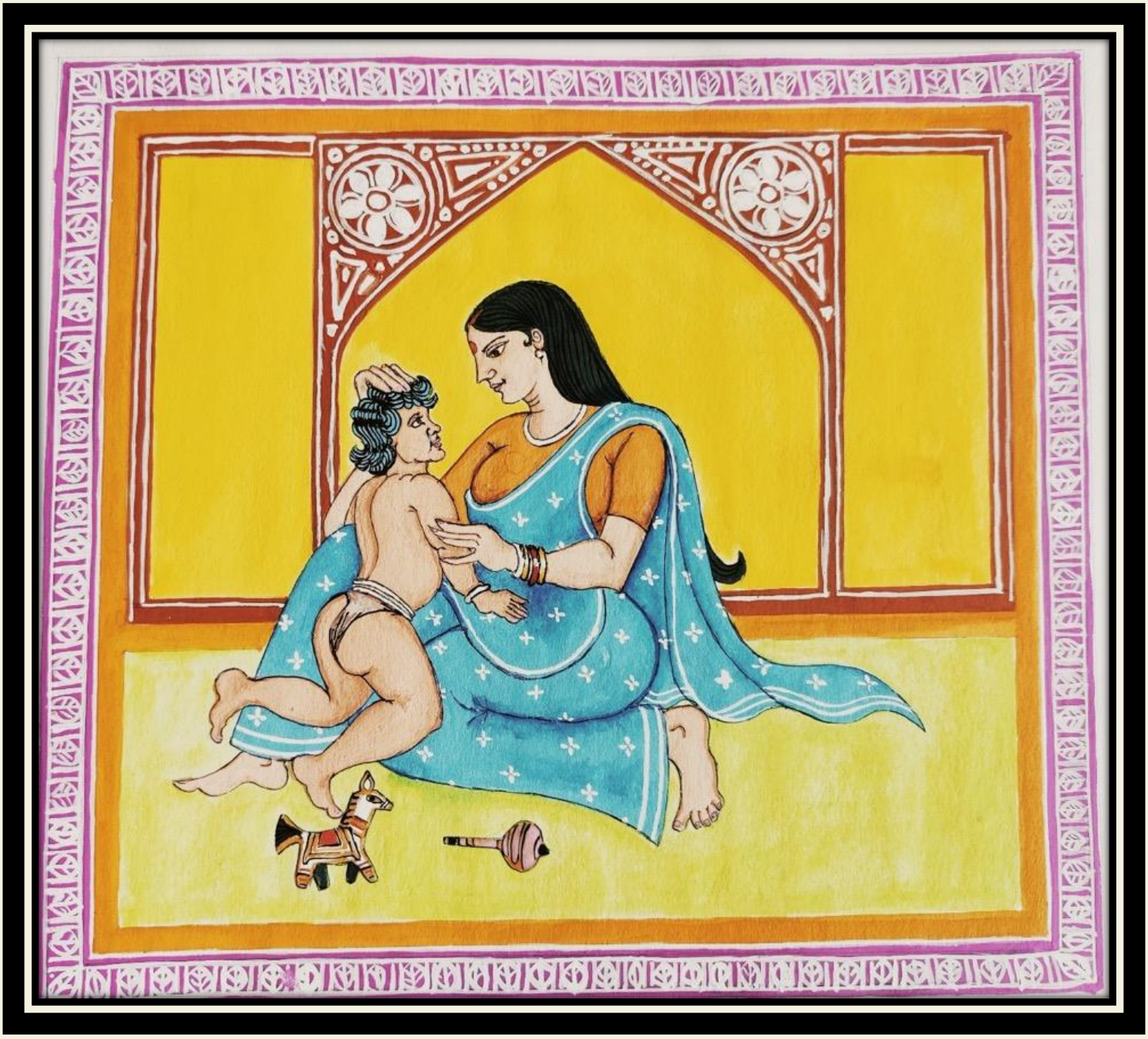

Dr. ABHIMANYU SENGUPTA

THE LAZY BOY

Devijaa Datta

Once there was a lovely garden in the village of Wildwood. All the people from Wildwood took care of the garden. Some children came to play in the garden. Sometimes, the villagers went for a picnic in the garden.
John was a boy from the village. He was very lazy and did not take care of the garden but he played and picnicked in the garden. The other villagers knew this and wanted to punish him. They went to the village old man Joseph and said, "John does not take care of the garden. Please help us." Joseph said, "Ok. Let's go for a picnic." The villagers were very confused. Joseph said, "Ask him for his favourite food and cook that for the picnic."

The villagers went to meet John and asked, “What’s your favourite food?" John said, “My favourite food is Bread and Potato curry".

On the day of the picnic, everyone sat for the food. John was going to eat the food. Just then, Joseph stopped him. He asked, “Where does the food come from?" John was silent. Joseph said, “The food comes from the trees and the plants you do not take care of."

The lazy boy said, "I didn't know this. I am so lazy that I never study. From now on, I will take care of the garden and also study."

The other villagers were very pleased and they had a lot of fun and enjoyed the picnic.

A little chatterbox studying in Class 1 of Indira National School, DEVIJAA loves to read, to discuss the epics, to dance and to recite. She has an exceptional ability to weave stories about anything.

SEVENTEEN

Shashmita Sanyal (Tiara)

The nestling knows she's going to fly
Why then, the mirror asks me, does she cry?
The nestling walks to the ledge, raises its wing
Why then, the free wind wonders, does songs of apprehension she sing?
Because, from time and story does she learn,
That after fledging away, seldom do they return

Settling into hostel was a haze,
Until I realised I'd forgotten my biggest suitcase
I'd buried in it comfort and convention
I'd forgotten candour and compulsion
Only trifles to seem, but attached is a sentiment not so little
Like the pungent smell of Nani's garlic pickle
Eavesdropping on the conversation next door
Whiling away summer months spread out on the cold floor
Stealing pieces of chicken from my brother's plate,
Oh! How much the Diwali cleaning I used to hate!
Dadu tinkering away all day on some broken toy
To join him in scolding Dad - oh, what a great joy!
Hot Wheels lying all over the living room
The big white lie - tomorrow I'll definitely clean my room
These are the things that make a home
And away from these now I will roam

The nestling takes a deep breath, flaps her wing
Takes off into the blue expanse, now only to dreams does she cling
But at night, heard by none, songs of memory and hope does she sing…

SHASHMITA SANYAL
Std 11, DAV Public School

SHREEJITA SENGUPTA

This collage truly depicts who I am, unmasked and unfiltered on one end and on the other hand, showcasing an integral part of life, the way I look every single day in these pandemic days.

Yes! That's me reporting for COVID duties, a doctor by profession, pledged to serve humanity under the Hippocrates oath but also a voracious reader, connoisseur of good food, an art enthusiast and dance is my stress buster.

গোধূলির ছায়া নামে ধীরে

অমিয় ষড়ঙ্গী

Mao Dun literary prize বিজয়ী Zhou Daxin's The sky gets dark slowly অবলম্বনে

গোধূলির ছায়া নামে ধীরে
ধূসর সন্ধ্যায়,
বেলা শেষে।
প্রতীক্ষার হল অবসান
যেতে হবে পথিকের বেশে
ঐ দূরে মেঘেদের দেশে।

ছিলাম যখন সদ্যোজাত শয্যাশায়ী
মাতৃক্রোড়ে নিবিড় আশ্রয়ে,
মনে আছে
ঊষা লগ্নে শঙ্খে আবাহন
এনেছিল হর্ষোল্লাস, অনুভূতিগুলি
চোখের আলোয় ক্রমে উদ্ভাসিত
হয়েছিল দেহমনে চেতনা স্পন্দন।

আজ এই পরিপক্ব বয়সের ভারে
আহরিত জাগতিক যত অনুভব
তারাই সম্বল। জানা গেছে
ইহকাল, দুর্লভ জীবনতত্ত্ব কিছু পরিচয়।
পরকাল জানা নেই
হয়তো বা অজানার ব্যাসকূটে
দিয়ে গেছে ফাঁকি,
কৌতুহল আজ নেই বাকি।

এখনও তো শয্যাশায়ী আমি
আজ এই গোধূলির ম্লান সন্ধিক্ষনে
পার্থিব সম্বল যা ছিল
দুর্বৃত্তরা নিতে চায় ছিনে
মাতৃহীন, বন্ধুহীন একাকী পথিক
বিদায়ের দিনে।

শেষ খেলা খেলে
আর কোন গোধূলির ছায়া মেখে
হঠাৎ কখন, বিদায়ের ঘন্টাধ্বনি শুনে
অশ্রুভেজা চোখ নিয়ে স্বজন বান্ধব
সবাই তো চলে গেছে ফেলে।

গোধূলির ছায়া নামে ধীরে,
অবশেষে উপস্থিত প্রস্থান সময়।
ঐ শোনা যায় মোহন বাঁশির সুর।
আনন্দের শিহরন জাগে মনে প্রাণে,
পুলকিত দেহ,
ফিরে যাব ছেড়ে এই গেহ।
মিশে যাবে জীবন তরঙ্গ
প্রকৃতি তরঙ্গে।
স্থান লব স্নেহময় জননীর নীড়ে।
অজ্ঞাতের ঠিকানায়, পরম নিশ্চিন্তে,
আনন্দের পুরে।

AMIYA SARANGI
শান্তিনিকেতন এবং আই আই টি খড়্গপুরের প্রাক্তনী ডঃ অমিয় ষড়ঙ্গী প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সৈন্য বিস্ফোটক বিভাগের অবসর প্রাপ্ত বিজ্ঞানী। কর্মজীবনে তিনি বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন এবং ধাতু ও বিস্ফোটক নির্দেশালয়ের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে অবসর গ্রহন করেন। দেশে এবং বিদেশে ভ্রমন করা, কবিতা পড়া কিংবা শোনা তাঁর শখের বিষয় আর কবিতা লেখাটা নিতান্তই অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য।

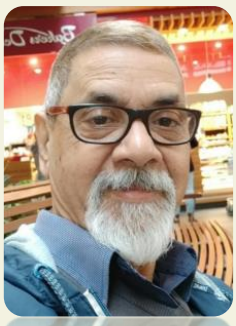

ESHNA SENGUPTA

A painting that depicts three celestial beings - all associated with Lord Vishnu and integral to the Vaishnava faith, all of them represented as half human and half animal in their physical forms. This was part of a design exercise seeking inspiration from our tales of yore for designing a fusion product that combines two dissimilar elements to create a distinct third that goes beyond their sum, both in appearance and functionality.

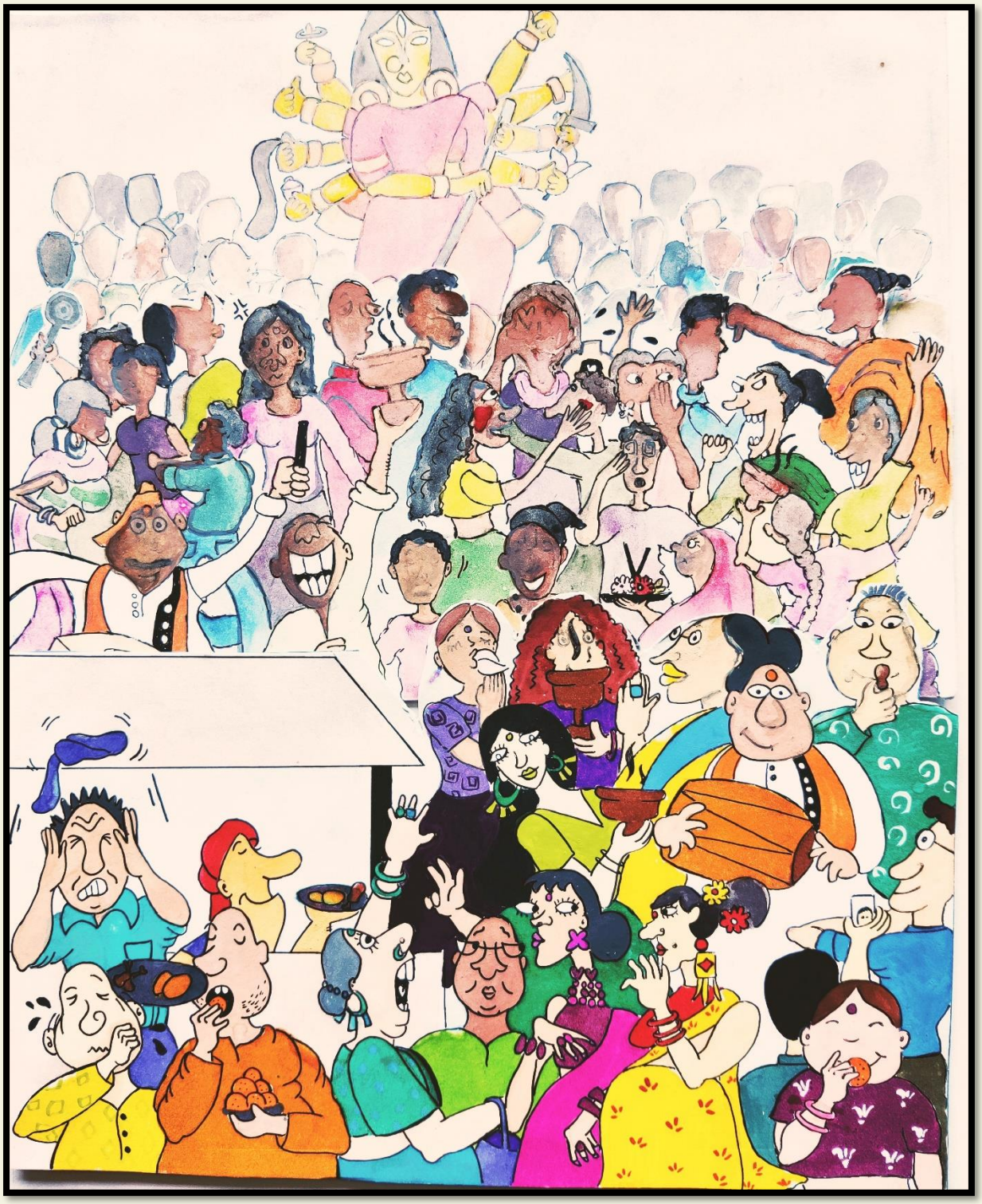

ESHNA SENGUPTA

Eshna is pursuing her graduate studies in Design at the MIT Institute of Design, Loni. Visual expression in its various forms has always fascinated her. Her artwork spans different styles and media seen in these pieces. She is also a trained Bharatnatyam dancer.

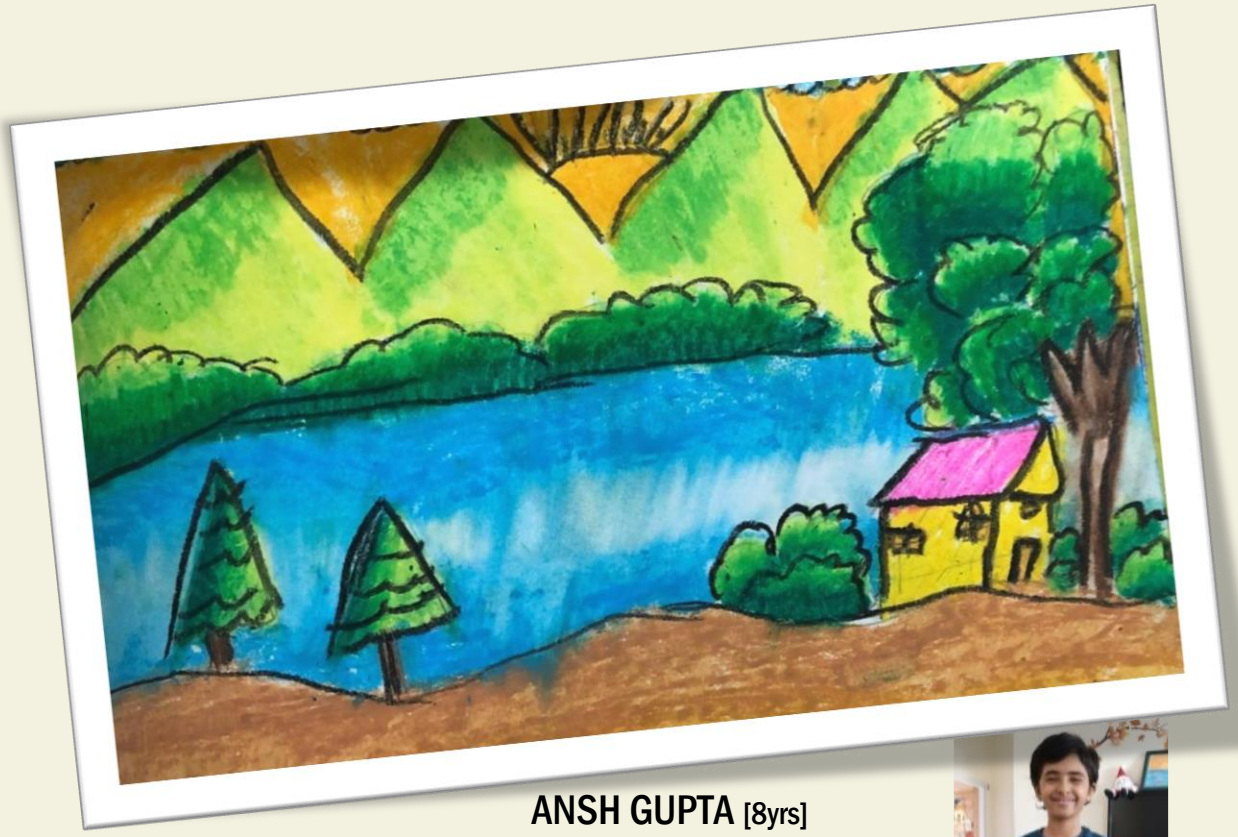

ANSH GUPTA [8yrs]
Class: 2
Vidya Valley School (Sus Road)

DEVIJAA DATTA
Class: 1
Indira National School

WHO IS THE BEST?

Shoumitree Gupta

Once upon a time in a small town, there lived two girls. Reena and Seema. They

were sisters. They were playing in the garden in front of their house in the morning. But then they got bored.

Reena said "Hey Seema! Let's make a craft or something! I really am getting bored playing in the garden... And besides, it's really very hot outside!"

Seema said “Ya, it is really hot. Good idea Reena, let's go in!"

Then their mother came out and said "Seema! Reena! Come, have some biscuits!"

So they went in to munch on some biscuits. After they ate, they changed their mind and decided to make a painting instead! They were not really in a good mood to make a craft.

So Seema made a drawing of a beautiful girl sitting on a bench. And Reena made a drawing of people going to the market.

After they finished their drawings, the two excited children came to show their drawings to their mother, one by one. She was amazed by their creativity! But then she said " Why don’t you show your

drawing to your sister too?"

So first Seema said "Reena! Come to see my drawing! Reena saw. She said "Wow! It is so nice! See mine!" So Seema saw and she said the same: " it's beautiful! But… Your one is nice… But not nice enough! I think mine is better! "

Now… here a fight starts! The girls started saying, "Mine's better!" "Mine's better! Ohh, you do not want to fight with me Seema!" Said Reena. Seema said "I can, definitely with your piece of junk! Reena said, "piece of junk?" Seena said "yes!" "Aaaaaaaaahhhhhhhh!!!", said Reena! A fierce battle started!

Meanwhile, their mother, who was downstairs working in the kitchen ran up the stairs when she heard the girls screaming and shouting at the top of their voices!

The children were so busy fighting, they hardly even noticed their mother standing in the room. This made her very angry. "STOP!" She shouted. The children, finally noticing her, got scared! None of them wanted to face their own mother! "What is the matter? Why are you fighting? I was trying to work!"

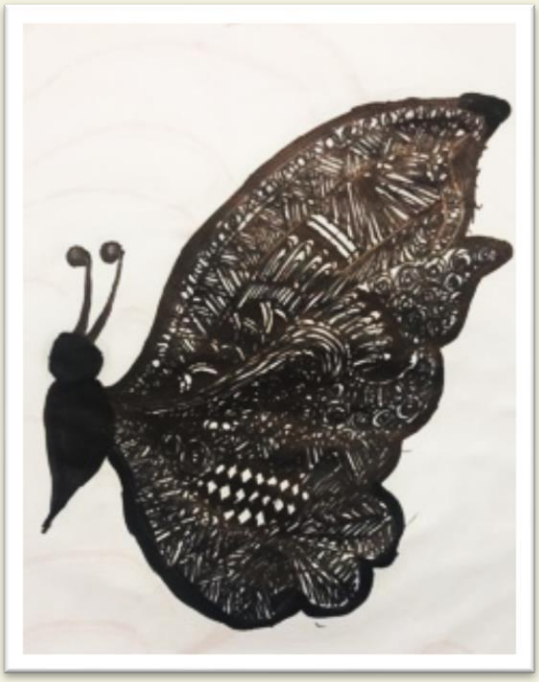

The two children were absolutely quiet. Then they said together "Mother! She said (pointing to each other) that my drawing is nice, very nice. But now she is saying that her drawing is better!"

"Is that the matter?" Mother asked. "YES!" Said the children together.

"HMMMM … Ok.. Let's see... first show me your drawings again, both of you!"

The children showed. And even pushed each other, to be first! Well it was Reena who got the first chance. Seema became sad. Mother said "Oh dear Seema! Don't be sad for such small things! It's Ok if you don't be first this time ! Next time, when we need to decide something again, it will definitely be you!" This made Seema cheer up.

"Ok.. Soooooooo.... Reena! I think your drawing should be like this... " (she took a pencil) and... ya! Done! Ok. Now Seema". "Now Seema, your drawing also needs changes (she makes corrections), hmm... I think this looks good, check this!"

But then… the children were angry... Do you know why? Because mother made some changes... But she didn't really tell who's drawing is actually better! Therefore, they were angry! Then both of them said together, "MOTHER! I THOUGHT YOU WERE GOING TO SAY WHOSE DRAWING IS BETTER! NOT MAKE IT LOOK BETTER!"

And then, Seema noticed something... "Wait… Wow! Reena! Because mother made these changes to your drawing, it's actually pretty nice!" Reena said " Thanks! I appreciate that! Yours is actually good too!" They laughed and smiled.

Then both of them said "Thanks Mother! Since you made our drawing look better, we really are not fighting anymore now! Thankyou! And sorry for shouting at you earlier..."

Then mother said "ohh… It's Okay! I know you were just a little angry! .. it's ok!"

So then the two naughty sisters,
and their mother did a great group hug!

Wow! How sweet! Now.. Everything was going fine. And they also did some drawings together which they had never done did before! It was almost like the fight was supposed to happen! So that they have a lot of fun! Playing hide and seek, playing hungry hippos… (a board game) They had a wonderful time!

SHOUMITREE GUPTA
Class IV
Sri Sri Ravishankar Vidyamandir

TISTA BANDYOPADHYAY

Grade 6

VIDYA VALLEY SCHOOL

Colors brighten her life as she brightens lives of those around her.

THE EMPTY NEST

Mautushi Sengupta

Neat and bare the rooms now lay
As YOU BOTH, my little ones have flown away,
No more toys all over the floor
No more mud stains on the front door.

Standing silently I hold back my tears
As I remember all those yesteryears,
When this house was full of endless laughter
Of games, fun and your non-stop chatter.

Through the empty house, my eyes look around
My heart cries out without any sound,
It's not been easy to see you leave
And I know your absence I'll forever grieve.

But I'm also so very proud of both of you
Of what you've become and what you will do,
So go out and conquer the world… Don't settle for less
Be gentle, be humble and spread love and happiness.

MAUTUSHI SENGUPTA

An electrical engineer by training with a post graduate degree in International Business, Mautushi Sengupta quit a corporate career to concentrate on raising her family. A couple of years down the line, she took to entrepreneurship, running a chain of successful pre-school and day care centres till her latest venture of providing quality, concept and evidence-based math and science education to high school students, enjoying her role as teacher and mentor to the fullest. She is a voracious reader, a movie buff and has a keen ear for music. She loves traveling and cooking.

AARYAN MUKHERJEE
Class V
Sanskriti School, Undri

SURANGANA BHATTACHARYA
Grade: IX
Sanskriti School

THE 100NM WEAPON OF MASS DESTRUCTION

AANAK SENGUPTA

The year 2030…

Humanity is on the brink of extinction, a deadly virus by the name of COVID – 19 has wiped out 99.9% of all living beings leaving a select few survivors left in a post-apocalyptic world. The virus takes no prisoners, affecting man-woman-child-rich-poor alike.

COVID-19 appeared in the Wuhan province in China in the year 2019 through the illegal Chinese food market and spread like wildfire. The virus was nothing like anything the world had ever seen before. Never before had such a deadly virus surfaced on earth; so contagious that it spread all across the whole world in a matter of just 6 months, leaving no country immune to its horrors. Doctors and scientists were stumped, no one had any answer to a virus which underwent mutation every time anyone came close to a cure. What started out as a contact-only virus, rapidly morphed into a lethal airborne and waterborne contagion engulfing mother earth in its tentacles like a hydra-headed monster. Showing up initially with fever and flu-like symptoms, proving fatal mainly among the elderly, COVID-19 quickly snowballed into a nightmare of unimaginable proportions - leading to cardiac arrests and degenerative neural damage among people of all ages. The world population steadily plummeted from 8 billion in 2019 to a mere million by 2030.

ISRO, Bangalore 2030…

A group of brilliant Indian Scientists led by Dr. Raman were working tirelessly in association with NASA and Rocosmos (Russian Space Program) in pursuit of wormhole technology to transport the remainder of humanity through space to any habitable planet – a desperate last ditch effort for humanity's survival. The few remaining scientists and astronauts had been toiling away for the past 9 years but to no avail; the possibility of another Earth seemed remote at best. But, Dr. Raman had never lost hope. After all, how could he? "Humanity's hope rests on your shoulders, my love, I'll see you again in heaven… Protect our daughter and save humanity, Promise me!", whispered his wife with her dying breath. "I promise, my love, I won't let you down", whispered back Dr. Raman, tears flowing uncontrollably down his face as the love of his life succumbed in his arms to the deadly virus.

Dr. Raman sat at the bedside of his teenage daughter, Anjali; droopy shouldered, hair streaked with grey, dark circles under his eyes, baggy with lack of sleep, his face belying his 45 years; a testimony to the 20 hours a day he had been putting in at the laboratory. 5 years had passed since that fateful day that Dr. Raman lost his wife, Geeta to COVID-19, and he had never been the same since. "9 years and still no closer to a workable cure. I have lost my mother and my wife to the deadly virus. I'm not about to lose my precious daughter too. She is all I have left in this world", thought Dr. Raman as he looked wistfully upon the peaceful face of his sleeping daughter. "The virus will not take you away from me, my dear… Daddy will find a way out, I promise...", whispered the scientist softly, his face a mask of steely grit and determination as he gently kissed his daughter's forehead.

ISRO, Bangalore, year 2035…

“Dr. Raman, this is the only possible way. We have exhausted all other possibilities. All our research points to planet EZ-716B, 2.8 million light years away in the Gargantula solar system in the Triangulum Galaxy. We call this planet “Excelsior”. This is the only planet with breathable air, reserves of ice and water where we have been able to document with reasonable certainty the presence of life. This is the only planet where humanity has a fighting chance for survival”, said his colleague, Dr. Kadam. “We have researched and gathered data on nearly 1500 billion planets, sir, and believe me when I tell you, this planet is our only shot, Sir. All of our best scientists have worked tirelessly on this for the past 9 years. I fear that if we wait on this any longer, humanity is doomed for sure!”, added his second in command, Dr. Chopra.

ISRO, Year 2040…

The insistent ring of the phone jolted the scientist out of his reverie. “Good evening, Dr. Raman! This is Dr. John Crawford speaking from NASA, Lead Engineer on the Wormhole project… I have extremely good news! After a great deal of research and experimentation, we at NASA have been able to perfect the wormhole technology. We just had our first successful test run. Just this afternoon, we have received Dr. Cartwright, our premier astronaut in-charge back on earth. In the last 5 years, he has successfully travelled to Jupiter and back, a gigantic leap for mankind. We always believed that theoretically wormholes could be used to cover astronomically large distances within very short periods of time. It is now practically possible! Once we are outside the earth’s atmosphere, all we have to do is lock in the coordinates of ‘Excelsior’ and we will reach there in no time! This technology completely changes our understanding of space and time; literally bending the rules of physics and facilitating nothing short of - teleportation!”

Dr. Raman was ecstatic beyond words, his heart almost skipping a beat! “What a miracle! At long last, my promise will be fulfilled”, the elated Dr. Raman thought to himself. He let out a joyous whoop, pummelling the air with his fist and triumphantly proclaimed the news to the whole of his lab at the top of his lungs. It felt like new life had just been breathed into him.

2044…

4 years had passed. Dr. Raman with Anjali and all his colleagues had just landed on Excelsior. As he stepped out of their spacecraft however, Dr. Raman’s elation changed to an expression of pure shock. His heart stopped in its tracks. The terrain was strewn with piles of dead bodies stretching to the horizon.

Alas! The COVID-19 virus had reached Excelsior before them…

AANAK SENGUPTA

A final year student of Electronics Engineering at BITS Pilani, Goa, Aanak is a voracious reader, music buff, gamer, basketball player and actively involved in social work. Aanak loves to travel and connect with people he meets on his journeys.

RUDRANI PAL
Class: Nursery
St. Mary's School

নাটকের বৈঠক

এবারে কোভিড এর জন্যে আমাদের পুজোর নাটক হল না কিন্তু আমাদের মনে হল নাটকের গল্প করতে তো বাধা নেই। সেই ভাবনা থেকেই আজকের এই বৈঠক।

পুণেতে বাংলা নাটকের চর্চার ইতিহাস বেশ পুরানো। গত পনেরো বছর ধরে পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদ (PPBP) নাট্যগোষ্ঠী এই নাট্যচর্চার সক্রিয় অংশীদার হয়ে আছে। আজ আমরা PPBPর এমন পাঁচজন মানুষকে আমাদের সঙ্গে পেয়েছি যাঁরা দীর্ঘদিন পুণের নাট্যজগতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন। আজকের আড্ডায় ওঁদের কাছ থেকে আমরা নাটকের গল্প শুনবো। ওঁদের অভিজ্ঞতা শুনে নিজেদের ঋদ্ধ করব।

চন্দ্রচূড়: নমস্কার। আমি চন্দ্রচূড় - আপনাদের সবাইকে আজকের বৈঠকে স্বাগত জানাই।

'পরিচয়' করে দেওয়ার জন্যে একজন মানুষকে যতটা জানতে, চিনতে লাগে সেটা না থাকলে ধৃষ্টতা করা হয়। আমি যাঁর পরিচয় দিলে অন্যায় হবে না তিনি হলেন আমার মেন্টর, আমার ডিরেক্টর ডক্টর অভিমন্যু সেনগুপ্ত। পেশাগতভাবে ডক্টর সেনগুপ্ত একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, 1991 থেকে তিনি পুণে শহরে প্র্যাকটিস করছেন। কিন্তু সেটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয় - ডক্টর সেনগুপ্ত প্রকৃত অর্থে একজন বহুমুখী প্রতিভা - শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারদর্শী, লেখক, অসম্ভব সুন্দর ছবি আঁকেন, শিক্ষক, প্রচুর পড়াশুনো করেন আবার তারই সাথে স্বাস্থ্য সচেতন। সমাজ সচেতন, সহমর্মী, সদাহাস্য ডক্টর সেনগুপ্ত দত্তক নেবার সমস্যা এবং শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন।

নাটক থিয়েটারের প্রতি ডক্টর সেনগুপ্তের অদম্য ভালোবাসা। বহুদিন উনি PPBP নাট্যগোষ্ঠীর কান্ডারী হয়ে আছেন। ডক্টর সেনগুপ্তকে আমরা সবাই ডাকি তানাজিদা বলে। এবার তানাজিদার কাছেই জেনে নেব নাটকের জন্যে ভালোবাসা ঠিক কবে থেকে। ছোটবেলা থেকে পুণেতে বড় হয়ে, পড়াশুনো করেও বাংলা নাটকের চর্চা কিভাবে হল, সেটা আমাদের যদি একটু বলো।

তানাজিদা: ধন্যবাদ চন্দ্রচূড়। কিন্তু তোমাকে তো আমাদের চন্দ্রচূড় বলে ডাকার অভ্যেস নেই, সবাই সিসিডি বলে ডাকি…

চন্দ্রচূড়: (হেসে) হ্যাঁ ওটা হলে আমারও সুবিধে হয়।

তানাজিদা: সবাইকে নমস্কার। আমাদের পরিবার 1962 থেকে পুণেতে আছে। ছোটবেলা

থেকেই Performing Arts এর দিকে আমার ঝোঁক ছিল। আমার বাবা, মাও আমাদের প্রচুর উৎসাহ দিতেন। আমরা যেখানে থাকতাম, সেই National Chemical Laboratory (এনসিএল) ঐ সময় একদম শহরের প্রান্তে ছিল। পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে পাহাড়, জঙ্গল, একটুখানি ভুট্টার ক্ষেত দিয়ে ঘেরা একটা সুন্দর জায়গা ছিল। ওখানেই আমার বড় হওয়া, গান শেখা, নাটক করা। ক্লাস ফোর বা ফাইভে প্রথম সিরিয়াস নাটক করলাম। শ্রী সুনির্মল অধিকারী - আমাদের অধিকারী কাকুর নির্দেশনায় শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের নাট্যরূপ 'রমা'য় যতীনের ভূমিকায়। অধিকারী কাকুকে দীপক কাকু আর ভৌমিককাকু চিনবেন - He was a wonderful, larger than life person. প্রথমবার প্রফেশনাল মঞ্চে টিকিটবিক্রি করে শো আর এদিকে আমি সবার ছোট, সবার আদরের, আহ্লাদের - এই ঘটনাটা স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আরো অনেক নাটক করেছি, ছোটদের নাটক, মা-ও করাতেন।

পাশাপাশি আমি একটা জেসুইট স্কুলে পড়েছি, সেখানেও নাটক হত তবে ইংরেজিতে। একটু বড় হয়ে ক্লাস ইলেভেনে টি এস এলিয়টের The murder in the cathedralএ আর্চবিশপ Thomas Beckett ভূমিকায় আর তারপর প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক ভূমিকা করি সফোক্লিসের আন্তিগোনেতে ক্রেয়নের ভূমিকায়। মনে রাখার মত ব্যাপার হল এইটা করে আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতায় সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছিলাম।

সিসিডি: দারুণ।

তানাজিদা: হ্যাঁ। তখন সবে 18 বছর বয়স। বয়সের তুলনায় ওটা খুব চ্যালেঞ্জিং একটা ভূমিকা ছিল। তারপর ডাক্তারির পড়াশুনোর চাপ এলো। সেসব কাটিয়ে আবার নাটক করার সুযোগ এলো 2004 সালে, পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদের পুজো শুরু হবার পরে। তখন আমার পরিচয় ছিল গানের জন্যে। আর এদিকে নাচের দিকটা সামলাত সুমিতা মহাজন - আমরা ডাকতাম মিতু। পেশায় সাংবাদিক, ভরতনাট্যম নাচত। প্রথম বছর, শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'বৌদির বিয়ে' হবে। এদিকে আমার আর মিতুর দুজনেরই ইচ্ছা নাটক করব। তো আমি আর মিতু একযোগে ধরে বসলাম যে নাটকে সুযোগ না দিলে আমরা নাচ বা গান করব না। (হাসি) এই ভাবে জোর করে আমার নাটকে ঢোকা। সেই শুরু। তারপর প্রত্যেক PPBP প্রযোজনায় আমি কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছি - এটা আমার কাছে একটা খুব গর্ব আর আনন্দের ব্যাপার।

সিসিডি: তাহলে এতক্ষনে সবাই বুঝেছেন তো যে বাকি গুরুজনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অধিকার কার আছে। তানাজিদা তোমার কাছে আমার অনুরোধ যে তুমি এবার সবার সঙ্গে আজকের আড্ডার বিশেষ অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দাও।

তানাজিদা: নিশ্চয়ই। আমাদের অতিথিদের প্রথমজন হচ্ছেন শ্রীমতি শিবানী সেনগুপ্ত - সকলের শিবানীদি বা বাংলাদিদি আর আমার মা। '62 সালে বিয়ের পর থেকে পুণের বাসিন্দা, এখানেই লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স

(LIS) এ স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং ডক্টরেটের পড়াশুনো। পেশাগত ভাবে LIS নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ভারতবর্ষের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসেবে অধ্যাপনা করেছেন।

মা ছোটবেলা থেকে সাংস্কৃতিক আবহে বড় হয়েছেন, বিয়ের পরে গোড়া থেকেই পুণের বাঙালী সমাজ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। পুণের সবচেয়ে প্রাচীন বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংসদের উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সেই সময়ে পুণের প্রথম এবং সম্ভবতঃ একমাত্র বাংলা গ্রন্থাগারটির পুনর্গঠন করেছিলেন।

গত কুড়ি বছর ধরে কলকাতার বিখ্যাত সংস্থা গীতবিতানের পুণে শাখা সুরঝঙ্কারে বাংলা শিখিয়েছেন - প্রবাসী বাঙালি, আধা বাঙালি, অবাঙালি, কচি কাঁচা থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সবাইকে। তাঁর অনেক ছাত্রছাত্রী নিখিল ভারত বঙ্গীয় সংসদের বাংলা ভাষার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

এনসিএল থিয়েটার গ্রুপের বিভিন্ন প্রযোজনায় অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিলেন - বিশেষতঃ প্রবাসে বাচ্চাদের নাটক করানোর জন্য ভীষণ উৎসাহী। মা, এবার একটু তুমিই বলো তোমার নাটকের সাথে জড়িয়ে যাওয়ার গল্পটা।

শিবানী কাকিমা: সবাইকে নমস্কার। অনেক কথাই বলে দিয়েছ। তাও কয়েকটা কথা বলি। ষাটের দশকে বিয়ের পরে যখন এনসিএলে থাকতে এলাম। তখন ওখানে অনেক বাঙালী পরিবার, কলকাতা থেকেও অনেক বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা আসত। নাটক, গান-বাজনা, নাচ সবরকম সংস্কৃতিচর্চার একটা ঝোঁক ছিল। ওখানকার ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন ডক্টর

জগন্নাথ গুপ্ত। খুব উৎসাহী মানুষ ছিলেন অনেক বড় বাড়ি, বাড়ি ভর্তি বই আর তাঁর বাড়ির দরজা সবসময় সংস্কৃতি চর্চার জন্য খোলা।

প্রথম প্রথম বাচ্চাদের নাটক হতো। এনসিএলএর ঘরোয়া প্রযোজনা, এনসিএলেই পরিবেশন হত। পরের দিকে খড়কি আর শিবাজীনগর এর বাঙালী সংস্থাগুলো থেকে আমন্ত্রণ আসত আর আমরা এনসিএল থেকে আমাদের নাটক নিয়ে যেতাম। এভাবেই আস্তে আস্তে আমি জড়িয়ে পড়লাম।

তানাজিদা: আমাদের পরের অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগে একটা গল্প বলার আছে। মহাভারতে গান্ধারীর একশ'জন সন্তানের কথা আছে। কিন্তু তার নাতি নাতনি কতজন ছিল এ নিয়ে কোনো গবেষণা আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু গান্ধারীকে প্রতিযোগিতার আসরে যদি কেউ মাৎ দিতে পারেন তিনি হলেন আমাদের পরবর্তী অতিথি শ্রীমতি শান্তি মুন্সী - বাচ্চাদের মুন্সীদিদা, সকলের মুন্সী মাসিমা আর আমার পিসী।

ষাটের দশকে পুণের বাঙালিদের নিয়ে বাংলার বাইরে প্রবাসে আরেকটা ছোট্ট বাংলা তৈরি করার স্বপ্ন নিয়ে পিসী সারাজীবন কাজ করে গেছেন। বাচ্চাদের জোগাড় করা, তাদের অভিভাবকদের রাজি করানো, ওদেরকে নাটক শেখানো, নাটক করানো সবকিছুতেই ওনার অমূল্য অবদান। ওনাদের বাড়িটা ছিল বাচ্চাদের নাটকের আখড়া - একটা অদ্ভুত পরিবেশ ছিল। পিসী কখনো হিটলার হয়ে যান, কখনো আবার মাদার টেরিজা। আর ওনার নাটক হল কল্পবৃক্ষের মত - চাইলেই রোল পাওয়া যায়। এমনকি পরিবেশনার দিন সকালে চেয়ে রোল পাওয়া গেছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। আমিও একবার পেয়েছিলাম, মনে আছে পিসী?

শান্তি জেঠিমা: হ্যাঁ মনে আছে বৈকি। গান গেয়েছিলি।

তানাজিদা: বাচ্চাদের মনে বাংলা নাটকের জন্যে ভালোবাসা জাগিয়ে তুলে তাদের অভিভাবকদের সহযোগিতায় অনেক দুর্দান্ত প্রযোজনা তিনি করেছেন। পিসি এবার তুমি বলো, পুণেতে তোমার নাটকের চর্চা কিভাবে শুরু য়েছিল।

শান্তি জেঠিমা: সবাইকে নমস্কার। আমিও ষাটের দশকে বিয়ে হয়ে পুণেতে এসেছি। '61 তে প্রথম নাটক করলাম। সংসদের পুজো তো তখন খুব ঘরোয়া - এখন কেউ বিশ্বাস করবে না। খুব আনন্দ হত - সবাই আপনার মত ছিল। নাটকের

রিহার্সাল হত আমাদের বাড়িতে - খুব উৎসাহ দিতেন ডক্টর গাঙ্গুলি। নাটকের প্রতিযোগিতা হত - ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকেও দল আসত। একবারের কথা মনে পড়ে, আমরা করেছিলাম তাপসী। প্রতিযোগিতায় জিতেছিলাম।

সিসিডি: আর দুই পুরুষের গল্পটা বলবে না?

শান্তি জেঠিমা: ও হ্যাঁ। দুই পুরুষ হয়েছিল জিমখানা গ্রাউন্ডে। নামলো খুব বৃষ্টি। এত বৃষ্টি যে সবাই চেয়ার মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে নাটক দেখেছিল। বৃষ্টির আওয়াজে কিছু শোনা যাচ্ছে না, আমরা যে যা পারছি সংলাপ বলছি, সে একেবারে ধুন্ধুমার ব্যাপার।

আরেকবার খড়কিতে পুজোর নাটক হচ্ছে মাটির ঘর। বাসস্ট্যান্ডের পেছনে স্টেজ বাঁধা হয়েছে, নাটক শেষ হয় হয়। হঠাৎ তুমুল বৃষ্টি নামলো আর সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড়িয়ে স্টেজ ভেঙে পড়ল। সবাই ভাবলো যে কলাকুশলীরা মানে আমরাও স্টেজের সঙ্গেই গেছি। কিন্তু সবাই জোর বাঁচা বেঁচে গেছিলাম। অনেক মানুষের কথা মনে পড়ে। মেজর চাকী আসতেন···

ভৌমিক কাকু: AFMC থেকে আসতেন।

শান্তি জেঠিমা: হ্যাঁ হ্যাঁ। AFMC থেকে আসতেন। ভীষন নাটক পাগল লোক ছিলেন, মহড়া শুরু হলে থামতে চাইতেন না। রাত দুটো অব্দিও চলেছে কখনো কখনো। ঐ মেজর চাকীর সময় থেকেই আমাদের বাড়িতে রিহার্সালের একটা ঘর সাজানোই থাকতো - আলমারি, বাসনকোসন সব।

সিসিডি: জেঠিমা আমরা আরো গল্প শুনবো, পরিচয়পর্বটা আগে হয়ে যাক।

তানাজিদা: আমাদের পরবর্তী অতিথি হলেন ভৌমিক কাকু - বিদ্যা বিজয় ভৌমিক সকলের জন্য চাঁদু। গত পঞ্চাশ বছর ধরে পুণের বাসিন্দা। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, ডিজাইনার,শিক্ষক আর সর্বোপরি একজন চিন্তাবিদ। দীর্ঘ 50 বছরের কর্মজীবন কেটেছে অটোমোটিভ ডিজাইনিংএ - দু চাকা, চার চাকা, এসইউভি নানা রকম গাড়ির ডিজাইন বানিয়েছেন।

উনি আমাদের সংস্থা পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদ এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের নাট্য গোষ্ঠীর Founding Father। ছোটবেলা থেকেই নাটক পাগল। স্কুলজীবনে এবং পরে আইআইটিতে বহু নাট্যোৎসবে শামিল হয়েছেন। পুণের নাট্যপ্রেমী একটা সম্পূর্ণ প্রজন্মের কাছে উনি হলেন গুরু - A constant source of encouragement, support and inspiration। অভিনয় এবং পরিচালনা দুই ভূমিকাতেই অত্যন্ত সফল - এই ছোট্ট পরিচয় পর্বে কাকুর ব্যাপারে সবটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এবার কাকুর মুখ থেকেই শুনবো। কাকু, তুমিই আমাদের বলো তোমার নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার গল্পটা।

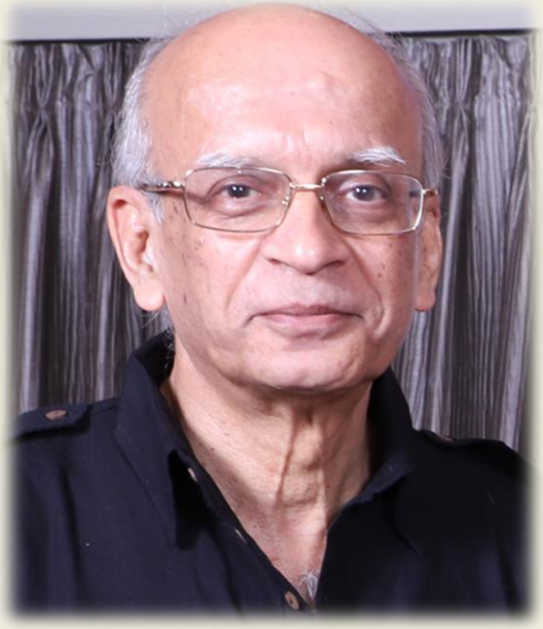

ভৌমিক কাকু: সবাইকে নমস্কার জানাই। আমার বাবা নাটক করতেন। জ্ঞান হওয়া ইস্তক বাবাকে প্রতিবছরই একটা দুটো করে নাটক করতে দেখেছি। আমি ছোটবেলায় শারীরিক ভাবে একটু দুর্বল ছিলাম - জন্ডিস, টাইফয়েড লেগেই থাকত। তাই খেলাধুলার দিকে সেরকম সুবিধে করতে পারিনি। নাটকের ব্যাপারে একটা স্বাভাবিক উৎসাহ ছিল - স্কুলে একটা দুটো নাটক করেছি, তারপর কলেজ আইআইটিতে প্রচুর নাটক করেছি।

সিসিডি: প্রথম কবে নাটক করলে পুণেতে?

ভৌমিক কাকু: পুণেতে দাদার বন্ধু ছিলেন প্রবাল রায় - তাঁর সূত্রে এনসিএলে নাটকের দলে

ভিড়ে গেলাম। তখন সুকৃতিদা বলে একজন ছিলেন সুকৃতি... পদবীটা মনে পড়ছে না।

শিবানী কাকিমা: রায়চৌধুরী.. সুকৃতি রায়চৌধুরী।

ভৌমিক কাকু: হ্যাঁ সুকৃতি রায়চৌধুরী। উনি বম্বে থেকে এসে নির্দেশনা দিতেন। কোন কারণে উনি ছেড়ে দিলেন আর তারপর নাটক পরিচালনার ভার আমার উপর এসে পড়ল। তারপর যখন পশ্চিম পুণে আরম্ভ হলো তখন যারা জীবনে কোনদিন অভিনয় করেনি, তাদেরকে ধরে, শিখিয়ে-পড়িয়ে স্টেজে তুলে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে নাটক করার আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দেওয়া - সে এক আলাদাই অভিজ্ঞতা। খুব fulfilling journey। এদের বেশিরভাগই পুণেতে দ্বিতীয় প্রজন্ম, বাংলা ভাষা তারা পড়তে পারত না। ভাষা শিখে, কখনো ইংরেজিতে বাংলা শব্দগুলো লিখে নিয়ে তারা যখন অভিনয় করে আনন্দ পেয়েছে - সেটা একটা পরম প্রাপ্তি।

তানাজিদা: Thank you কাকু। এবার পরিচয় করিয়ে দেব শ্রী দীপক চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ওনার আলাদা করে পরিচয় করানোর কোন দরকার নেই - পুণের নাট্যজগতে উনি একজন প্রতিষ্ঠান। আমার এবং অনেকের কাছে উনি দীপক কাকু আবার অনেকে ওনাকে দীপকদা বলেও ডাকে। প্রবাসে বড় হয়েছেন। ছোটবেলায় ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় পুজোর নাটক রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' দিয়ে নাটকের হাতে খড়ি। কলেজে পড়ার সময় প্রথম সিরিয়াস নাটক করা নাটকের প্রতিযোগিতার জন্য - যদিও সেগুলো হয়েছিল হিন্দি ভাষায়। পেশায় কাকু একজন ইঞ্জিনিয়ার, কাজের সূত্রে পুণে আসেন '65 সালে। নাটকের সঙ্গে সম্পর্কটা আবার ঝালিয়ে নেন, সত্তরের দশকে কলকাতায় থাকার সময় প্রচুর নাটক দেখা, নাটক নিয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ হয়। আশির দশক থেকে আজ পর্যন্ত পুণের নাট্যজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন। বলতে কোন দ্বিধা নেই, নাটকের যে কোন শাখায় কাকুর অপার জ্ঞান এবং দক্ষতা। ওনার নিজের ভাষায় "জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ" সব ব্যাপারেই উনি সিদ্ধহস্ত। কাকুর সাহায্যের হাত সবসময় বাড়ানো থাকে। কাকু তোমার কাছে যা শিখেছি তা কোন নাটকের স্কুলে শেখা যায়না - হাতেকলমে ঠেকে শেখা। কাকু এবার তোমার কাছেই গল্পটা শুনবো।

দীপক কাকু: নমস্কার সবাইকে। ঐ যে ক্লাস ফাইভের ডাকঘরের গল্পটা বললে সেদিন দর্শকের আসনে ছিলেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

তানাজিদা: তাই!! My God!

সিসিডি: আরিববাস!

দীপক কাকু: নাটক দেখার পরে খুশি হয়ে উনি মঞ্চে উঠে আমাকে একটা ফাউন্টেন পেন উপহার দিয়েছিলেন। এর থেকে বেশি পাওয়া আর কিছু হয়না। বাংলা পড়তে আরম্ভ করি ক্লাস ফাইভে।আমার ক্লাসে একটি ছেলে ছিল, আমি তাকে অঙ্ক আর ইংরেজি দেখিয়ে দিতাম, বদলে সে আমাকে শেখাত বাংলা - আবৃত্তি। বাইরে যা হয়, দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজোয় অনুষ্ঠান হত। কিন্তু সবচেয়ে বড় যেটা হতো সেটা হচ্ছে স্টেজটা বাঁধা থাকে শুরু করে সব হয়ে যাওয়ার পরে আবার খুলে গুছিয়ে রাখা অব্দি সমস্ত কাজ আমাদেরই করতে হতো। তারপর কলেজ, আমি পাশ করেছি আইআইটি রুরকি থেকে। ওখানেও নাটক করে প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছি।

সিসিডি: তারপর প্রথম কবে নাটক করলে পুণেতে?

দীপক কাকু: চাকরি সূত্রে '65 তে পুণে এলাম,উঠলাম সুবিখ্যাত কিসমত লজে। কিসমত লজের অনেক গল্প, খুলে বসলে এখন পুরো আড্ডাটাই চলে যাবে। ঋত্বিক ঘটকও মাঝেমাঝে আসতেন, আমাদের বাঙালি ঠাকুর মাছটা রাঁধতেন চমৎকার।

যাইহোক প্রথম নাটকের সুযোগ এলো 'মেঘে ঢাকা তারা'। ফিল্ম ইন্সটিটিউটের–নামটা ঠিক মনে পড়ছে না –বোধহয় সমীরণ দত্ত আমাদের এই নাটকটার নির্দেশনা করেছিলেন। ওনার সাথে রিহার্সাল করার সময় নতুন করে শিখলাম স্টেজে কি করে হাঁটতে হয়, কি করে কথা বলতে হয়, একটা প্রফেশনাল নাটক করার জন্য যেগুলো খুব দরকার।

সিসিডি: এটা কি সিনেমাটা রিলিজের আগে না পরে?

দীপক কাকু: পরে, পরে। ঐ '66 মত হবে। সিনেমাটা এসেছিল '60তে। তখন হয়তো নাটক এত সুপরিকল্পিতভাবে হত না কিন্তু যারা করতেন তারা খুব ভালোবেসে অধ্যবসায় দিয়ে করতেন। এরপরে কিছুদিন কলকাতা। তারপর আবার পুণে ফিরি। '89 এ নাটক হল 'তাসের দেশ'। তানাজি গান গেয়েছিল।

তানাজিদা: হ্যাঁ গিয়েছিলাম মনে আছে।

দীপক কাকু: আরেকটা নাটক ছিল 'ল্যাঙ্গুয়েজ' - খুব হিট করেছিল, চারবার শো হয়েছিল।

তানাজিদা: হ্যাঁ ভীষণ সুন্দর।

সিসিডি: শান্তি জেঠিমা, তুমি বাচ্চাদের নাটকের সাথে কিভাবে জড়িয়ে পড়লে?

শান্তি জেঠিমা: প্রথম প্রথম এসে দেখলাম এখানে বাচ্চারা বাংলা বলে না। স্কুলে হিন্দি, ইংরেজি শেখে পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের সাথেও তাই-ই বলে। আমার খুব মনে হতো যে এদের যদি একটু বাংলা শেখানো যায়। যখন পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদ শুরু হল, আমার প্রথম প্রথম খুব ভয় হতো। পারব তো? তখন রত্না, অপু ওরা বলল যে কেন পারবে না? এর আগে গনেশখিন্দের পূজায় বাচ্চাদের নিয়ে পূজারিণী করিয়েছিলাম। তারপর নাটক হল, ঠাকুমার ঝুলির বুদ্ধু ভুতুম। শিবানীদিও ছিল। আমি হয়েছিলাম ঠাকুমা আর আমার গলায় গল্প বলেছিল শিবানীদি। সেই থেকে আজ অব্দি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

সিসিডি: পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদ এ বছর ষোল পূর্ন করল। এবার ভৌমিক কাকুর কাছে জানব নাটক কি প্রথম থেকেই PPBPর সংস্কৃতিচর্চায় শামিল ছিল?

ভৌমিক কাকু: আমরা যারা পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদ (PPBP) শুরু করেছিলাম - Mr Biaksh Lal Mitra, Mr Dilip Chatterjee, Mr Nikhil Krishna Munshi, Mr Gautam Ghosh - আমরা সবাই প্রথম দিন থেকেই ঠিক করেছিলাম যে PPBPতে আমরা কখনো বাইরের শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করব না। আমরা সব সময় নিজেদের সংস্থার সদস্যদের প্রতিভার বিকাশের চেষ্টা করব। এই সিদ্ধান্ত আমাদের PPBPর সংবিধানের অঙ্গ। নাচ, গান, বাচ্চাদের নাটক, বড়দের নাটক যাই হোক না কেন আমরা নিজেরাই করব। তাতে প্রথমদিকে অনেক অসুবিধা হয়েছে। আগেই বলেছি, কোনদিন নাটক করেননি এমন অভিনেতাদেরও হাত ধরে, জোর করে আমরা স্টেজে তুলে দিয়েছি। 'ছন্দপতনে'র সময় দেবযানী, 'সোনার মাদুলি'র সময় নেহা, 'শেষরক্ষা'র সময় স্বাগতা - এরা সবাই যখন এসেছে তখন কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দারুণ perform করেছে আর খুব আনন্দ করেছে।

এমন অনেকে নেচেছে, যারা নিজেরাই জানতো না তারা নাচতে পারে। অনেক অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছি। আজ যে আমাদের একটা ট্যালেন্ট পুল তৈরি হয়েছে - performer আর organizer দুদিকেই, সেটা ঐ সিদ্ধান্তেরই সুফল। এটা একটা self-propelling journey, খুবই fulfilling.

সিসিডি: দীপককাকুর কাছে যাবো। PPBPতে প্রথমদিকে নাটক করার কি কি চ্যালেঞ্জ ছিল? কিভাবে সামাল দিতে সবদিক?

দীপক কাকু: PPBPতে প্রথমদিকে নাটক করার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ - যারা নাটক করছেন তাদের সময়ানুবর্তিতার অভ্যাসটা করানো। এই নিয়ে আমার ভীষণ দুর্নাম ছিল - ভীষণ বকতাম। তখন মহড়া শুরু হতো রাত দশটা থেকে, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে এসে জুটতাম আর মাঝরাত অব্দি মহড়া চলত। তো একদিন প্রবল বৃষ্টি। একজন অভিনেতা সাড়ে দশটা অব্দি এসে পৌঁছয়নি। আমি তাকে টেলিফোন করে বললাম, "হয় তুমি 15 মিনিটের মধ্যে আসছ, নয়তো

এবারের নাটকের জন্যে আর আসার দরকার নেই"। ওই বৃষ্টি মাথায় করে সেই অভিনেতা ভিজতে ভিজতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। ঐ সময় সেই অধিকারটা ছিল। আজ হয়তো আর ওরকম ভাবে চেঁচিয়ে বলার অধিকার নেই।

সিসিডি: (হেসে) কেন! এখনো প্রতিবারই তো তোমার কাছে বকা খাই।

তানাজিদা: কিন্তু কাকু এখন তুমি আর দেরি করে আসার জন্য সেরকম বকাবকি করার সুযোগ পাওনা, বলো? আমরা এতো ডিসিপ্লিন্ড হয়ে গেছি। (হাসি)

দীপককাকু: (হাসি) হে হে হে।

সিসিডি: শান্তি জেঠিমা, বাচ্চাদের নাটকে কিরকম চ্যালেঞ্জ ছিল?

শান্তি জেঠিমা: একদম শুরুর দিকে বাচ্চাদের মা-বাবারা বাংলা নাটক করানোর জন্য সেরকম উৎসাহিত হতেন না। যদি বা এল, তাদের বাংলার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। বাড়িতেও বাংলায় কথা বলে না। উচ্চারণের ভীষণ সমস্যা হতো। আমি গিয়ে তাদের ডেকে ডেকে নিয়ে আসতাম।

তার কিছুদিন পরে উল্টো সমস্যাটা দেখা দিল। হয়তো নাটক ঠিক হয়ে গেছে, চরিত্র ঠিক হয়ে গেছে, তখন পাঁচজন এসে উপস্থিত হলো। তারাও PPBPর মেম্বার, (হেসে) হাত পেতে চাঁদা নিয়েছি, নাও বলতে পারিনা। তখন স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসে চরিত্র ঢুকিয়ে ম্যানেজ করতে হত।

EXPERIENCE OF PPBP THEATRE

Vivek Shome

I am indebted to Munshi Thamma for introducing me to Bengali drama. Participating in the PPBP Naatoks over the years has been one of the best decisions I've ever made. Over time, we stray further from the culture that has formed our peoples' identity, but PPBP Naatok has helped me stay grounded to my roots.

I was introduced to a trove of rich Bengali literature and music, and learned more about the life and struggles of great Bengali men like Swami Vivekananda. Acting in a play is more than just reading off a script and standing on a stage - it requires physical and emotional dedication by transfiguring yourself into the character you play. Over nine years, I mastered the craft and learned how to effectively read scripts, deliver emotional lines, and give powerful speeches.

The experience has taught me essential life skills - my participation helped enhance my comprehension and public speaking skills. I was able to pivot my experience in Naatok to debate and extempore speech, where I found great success. These skills are not easy to learn, but theatre provides a fun, engaging way to do so.

I highly recommend participating - not only do you gain valuable skills and experiences, but also have fun and make friends along the way ☺

স্ক্রিপ্ট লিখে দেওয়ার জন্য কাবেরী, মৈত্রেয়ীকে ব্যস্ত করতাম। ওরা আমার সব আবদার মেনে লিখেও দিত।

কিন্তু স্ক্রিপ্ট লিখেও আমার কুলোত না। শেষ মুহূর্তের আব্দার সামলাতে অনেক সময় তাদেরকে বেলুনওয়ালা বানিয়ে, পার্শ্ব চরিত্র বাড়িয়ে কমিয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট করতাম। আমার বাচ্চারা আর তাদের মা'রাও আমাকে খুব সাপোর্ট করেছেন। বাচ্চাদের কত বকতাম, কিন্তু ওরা কখনো রাগ করতো না। ওদের মা'রাও কখনো আমাকে কিছু বলেনি। স্টেজে উঠে ওরা ঠিক করে নিতো।

সিসিডি: নাটকের দল হিসেবে পশ্চিম পুণে বঙ্গীয় পরিষদের নাট্যগোষ্ঠীর একটা সুনাম আছে। পুণেতে অন্য সংস্থার অনুষ্ঠানে যখন যাই তখন বুঝতে পারি যে PPBP কি করবে, PPBP কিভাবে ভাবছে এটা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে, নাট্যপ্রেমীদের মধ্যে একটা আলাদা প্রত্যাশা আছে।

ভৌমিক কাকু: Yes. It's a brand now.

সিসিডি: Exactly. এই ব্র্যান্ডিংটা একদিনে হয় না, এটা কিভাবে হল?

ভৌমিক কাকু: আমরা কখনও গুণবত্তার সাথে আপোষ (Compromise) করিনি। "চলেগা", "চলতা হ্যায়", "হয়ে যাবে" এভাবে কখনো ভাবিনি। বকাঝকা হয়েছে, তর্ক হয়েছে, কিভাবে একশো ভাগ ঠিক করা যায়, সবসময় তার চেষ্টা হয়েছে।

আমরা Equalityতে বিশ্বাস করি - ছোট, বড় সবার জন্য এক নিয়ম, এক ডিসিপ্লিন। সবাইকে 100 ভাগ দিতে হবে। এভাবে চেষ্টা করেছি, কতটা পেরেছি সে উত্তর তো দর্শকদের কাছে চাইতে হবে।

শিবানী কাকিমা: আমি কিন্তু বলব প্রথম থেকেই আমি দেখেছি PPBPতে সবাই নাটকের জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করে। স্ক্রিপ্ট খোঁজার জন্যে এ তল্লাট থেকে ও তল্লাট দৌড়ানো, তারপর তার এডিটিং, তারপর আবহ, মঞ্চসজ্জা, সবকিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। চাঁদু যে বলল No Compromise, ওটা কিন্তু সব জায়গায়, উত্তরোত্তর ভালো করার ক্রমাগত প্রয়াস। পরে যারা এসেছে তারাও এই attitudeটা অক্ষুণ্ণ রেখেছে - ভীষণ high level of commitment।

তানাজিদা: আমাদের অনেকে অন্য শহর থেকে এসে রিহার্সাল দিয়েও অভিনয় করেছে - রণ ব্যাঙ্গালোর থেকে আসতো।

সিসিডি: শুভদাও একবার মাঝপথে ব্যাঙ্গালোর চলে গেল। তারপর যাতায়াত করে রিহার্সাল দিয়েছিল।

তানাজিদা: আমার অন্বেষার কথা মনে পড়ছে। বম্বে থেকে এসে রিহার্সাল দিয়েছে। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে শনিবার বিকেলে আসা,

রাত্তিরে ফিরে যাওয়া। আবার রবিবার দুপুরে আসা এবং ফিরে যাওয়া।

ভৌমিক কাকু: এরকম কমিটমেন্ট আর নাটকের জন্যে ভালোবাসা একরকম অসম্ভব। শহর হিসেবে পুণে গত এক দশকে তার চরিত্র বদলেছে। জনসংখ্যা বেড়েছে, বাঙালির সংখ্যা বেড়েছে। এর সাথে যে ধরণের দর্শক আমাদের নাটক দেখেন তাদের রুচি, পছন্দ-অপছন্দ, এগুলো কিভাবে বদলেছে? এর সাথে আমাদের প্রযোজনায় কি ধরণের বদল এসেছে?

তানাজিদা: প্রথম দিকে পুজোটাও ছোট ছিল মেম্বারশিপও ছিল কম। যখন নাটক হত তখন আমাদের বাড়ির লোক, বন্ধুবান্ধব এরাই থাকতেন দর্শকাসনে। তখন আমরা তাঁদের রুচি, ভালোলাগা, মন্দলাগা নিয়ে এত মাথা ঘামাতাম না। নাটক হচ্ছে সবাই মিলে কিছু একটা করছি এই আনন্দটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখন এটা অনেকটা বদলে গেছে। আমাদের এখন একটু ভাবতে হয়, যে কি ধরনের নাটক করলে দর্শকের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

সিসিডি: দীপককাকু তুমি পুণের বৃহত্তর নাট্যজগতের সঙ্গে জড়িয়ে আছো। এই একই প্রশ্ন যদি পুণের সম্পূর্ণ নাট্যজগতের হিসেবে করা হয় তাহলে পৃথিবীর বিবর্তন ঠিক কিরকম ভাবে হয়েছে?

দীপক কাকু: ষাটের দশকে চারদিন নাটক হত। রিহার্সালের পরে ভোর অব্দি সিনেমা চলত। আজ যে বৌদিরা বসে আছেন, তাঁদের জন্যে আমাদের বেবি সিটিং করতে হত।

শিবানী কাকিমা, শান্তি জেঠিমা: (হাসি থামছে না)

দীপক কাকু: "আমরা এখন রিহার্সাল দিচ্ছি, এদের ধরে বসে থাক। আমরা বসে থাকতাম।"

তানাজিদা: তোমাদের বেবি সিটিং করতে হত?!

দীপককাকু: (হাসতে হাসতে) সে বেবীরাও এখন পঞ্চাশোর্ধ্ব। তাদের নাম আর নাই বা নিলাম।

কিন্তু নাটক পাগল লোকজন ছিলেন। আশির দশকে নাটক যাঁরা করতেন তাঁরা সিরিয়াস নাটক নিয়ে ভাবনাচিন্তা আরম্ভ করলেন। প্রচুর ভালো ভালো স্ক্রিপ্ট - এবং ইন্দ্রজিৎ, লবনাক্ত, নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র নিয়ে কাজ হয়েছে। গ্রুপ থিয়েটারে অনেকে পুজোর নাটককে জাতে তুলতে চান না। কিন্তু আমি এর সঙ্গে একমত নই। আমার কাছে পুজোর নাটক অনেক বেশি কঠিন - সঠিক মঞ্চ নেই, আলো করা যায়না, সাউন্ড কোনমতে করা হয়….

সিসিডি: আরেকটা জুড়ে দাও - ওখানে পয়সা দিয়ে নাটক দেখতে আসা দর্শক আর পুজোতে "এগরোল খেতে খেতে একটু দেখে নিই" দর্শক।

দীপককাকু: (হাসতে হাসতে) তবু পুজোর সময় তিনশো লোক বসে নাটক দেখে। আর টিকিট বিক্রি করে পঞ্চাশ জন লোক হয়না। এটাই তফাৎ। যারা নাটক করে আর যারা নাটক দেখে, তারা ছাড়া আরেকটা পরিবর্তন হয়েছে। সেটা হল যারা ব্যাকস্টেজে থাকে। প্রথমদিন থেকে আমরা চেষ্টা করেছি এই ব্যাকস্টেজের দলটাকে মজবুত করতে। নাটকের শেষে আমরা সবার আগে ব্যাকস্টেজের লোকেদের নাম বলি। বিশেষ করে প্রম্পটারদের। (হাসি) আমাদের বলা হত যে তিন বুড়ো মুখস্থ করেনা, ওদের পেছনে তিনজন প্রম্পটার লাগবে।

সিসিডি: (হাসতে হাসতে) গীতাবৌদি আর কাজল কাকিমা না এলে তো রিহার্সাল, রিহার্সাল বলেই মনে হয়না। ওঁরা যেদিন থেকে আসেন, সেদিন থেকে অন্যরকম মজা শুরু হয়।

তানাজিদা: ওঁদের আগে প্রথম বারো তেরো বছর শ্রীলা কাকিমা কিন্তু বেশিরভাগ নাটকে প্রম্পট করতেন। কাকিমা বুঝে ফেলতেন কার কিরকম প্রম্পটিং লাগবে, অনেকদিন উনি পরের প্রজন্মকে গ্রুমও করে গেছেন। একবার সিনিয়র সিটিজেনদের নিয়ে করা একটা শ্রুতিনাটকে কাকিমা অভিনয় করেছিলেন। স্টেজের মধ্যে বসতে পেয়ে কাকিমা খুব খুশী হয়েছিলেন।

সিসিডি: শান্তি জেঠিমার কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে যাবো। বাচ্চাদের নাটকেরও তো খুব সুনাম। সব প্রতিযোগিতায়, নাট্যোৎসবে PPBPকে থাকতেইহবে।

শান্তি জেঠিমা: হ্যাঁ আর বাচ্চাদের নাটকে কিন্তু প্রম্পটার থাকেনা। সবাই PPBPর ব্যাপারে বলে যে আমাদের বাচ্চাদের বাংলা উচ্চারণ খুব স্পষ্ট।

এ ব্যাপারে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একবার sims এ পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ এসেছিলেন। বাচ্চাদের নাটক দেখে, তাদের বাংলা উচ্চারণ শুনে আমায় এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এতো স্পষ্ট উচ্চারণ, এরা কি সবাই প্রবাসী?" সেদিন আমার বাচ্চাদের নিয়ে খুব গর্ব হয়েছিল।

সিসিডি: কোন প্রযোজনার কথা মনে পড়ে তোমার?

শান্তি জেঠিমা: বিলে থেকে বিবেকানন্দ খুব ভালো হয়েছিল। লক্ষ্মনের শক্তিশেল। আজব বাক্স। এ ব্যাপারে একটা কথা বলি - আগের বার দিশারী আমাকে অনুরোধ করেছিল যে দুএকজন ভালো অভিনেতাকে যদি আমি রেফার করে দিই ওদের একটা প্রযোজনার জন্যে। আমি কাউকে

পাঠাইনি। অনেক অভিভাবকদের ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। কিন্তু আমি কি করব বল! আমার কাছে সব বাচ্চাই সমান। আমার কাছে কেউ বিশেষ নয়।

সিসিডি: এবার একটু প্রসেসটা আলোচনা করি। একটা থিম বা উপস্থাপনার আঙ্গিক কি ভাবে ঠিক করো? স্ক্রিপ্ট কিভাবে ঠিক হয়? সবসময় তো স্ক্রিপ্টের দাবী মেনে অভিনেতা পাওয়া যায় না। আবার উল্টোটাও হয়।

তানাজিদা: যেহেতু পুজোর নাটক তাই একটা কমেডির মোড়ক আমাদের রাখতেই হয় - এটা ঠিক সবাই মিলে বসে নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়। তবে সবাই নির্মল আনন্দ পাবে, একটা আনন্দের স্মৃতি নিয়ে বাড়ি যাবে এটাই উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম দিকে সব সামাজিক বা পারিবারিক নাটক হত। এক বছরই আমরা একটা থ্রিলার করেছিলাম - ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক পেয়ালা কফি'।

ভৌমিক কাকু: স্ক্রিপ্ট বাছা নিয়ে আমরা একটা structured পদ্ধতি নিয়েছিলাম। যারা সরাসরি নাটকের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কিছু মানুষকে আমরা Sounding Board এর মত ব্যবহার করতাম।

তানাজিদা: Audience Perspectiveটা পাওয়ার জন্য।

ভৌমিক কাকু: হ্যাঁ। এর মধ্যে তোমাদের উমা কাকিমা ছিলেন, ঝুমকিকে অনেকবার ডেকেছি। ধরো ছ'টা স্ক্রিপ্ট শর্টলিস্ট হল - সাউন্ডিং বোর্ডের সদস্যরা এই স্ক্রিপ্টগুলো পড়ে একটা স্ট্রাকচার ফিডব্যাক দিতেন। তারপর সেরা দুটোকে বেছে নিয়ে আমরা যারা নাটকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তারা final selection টা করতাম। (Selection of a script).. was not a gut feeling.

সিসিডি: বাঃ! এতে একটা কমফোর্ট জোনে আটকে যাওয়ার ভয় থাকেনা।

ভৌমিক কাকু: তবে আমার মনে হয় স্ক্রিপ্ট সিলেকশন এর চেয়েও Editing was a bigger challenge. সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্যে You have to be..

তানাজিদা: Ruthless.

ভৌমিক কাকু: একদম ঠিক! আমার থিওরি হচ্ছে, আলাদা করে দেখলে সব দৃশ্য, সব সংলাপই খুব ভালো। কিন্তু সবটা মিলিয়ে Holistically বিচার করলে আমাকে কিছু বাদ দিতেই হবে। নইলে দৈর্ঘ্যে কুলনো যাবে না, দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। এতে হয়তো কিছু অভিনেতা কখনো ক্ষুণ্ন হয়েছেন, কিন্তু আমরা কখনও আপোষ করিনি।
তবে এই কোনটা রাখবো আর কোনটা কাটবো এইটা বাছা খুব কঠিন কাজ। খুব।

তানাজিদা: স্ক্রিপ্টের ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে দুএকটা উদাহরণ দিই। যেমন ধরো 'সোনার মাদুলি'র শেষে জমিদার আত্মহত্যা করছেন, পুজোর নাটকে এরকম একটা সমাপ্তি রাখা যায়

না। আমরা ওটাকে Happy Ending করে দিয়েছিলাম। আবার হনুমতী পালা করার সময় আমরা দেখলাম যে নাটকটার শেষটা খুব abrupt, তখন আবার ভাবনাচিন্তা করে শেষটা লেখা হল।

দ্বিতীয় রকমটা হল যেখানে চরিত্র বদলাতে হয়।

ভৌমিক কাকু: ফাঁস! ফাঁস!

তানাজিদা: ঠিক কাকু। আমরা শৈলেশ গুহ নিয়োগীর ফাঁস করেছিলাম তিন চার বছর আগে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন স্ত্রৈণ পুরুষ - পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট। তার অধঃস্তন আরো চারজন পুলিশ, সঙ্গে আছে এক মাদক পাচারকারী বাবা আর তার ছেলে। এদিকে আমাদের সেবার মহিলা অভিনেতার ছড়াছড়ি। অগত্যা পুলিশ সুপার হয়ে গেলেন একজন মহিলা। তার স্ত্রী হয়ে গেলেন তাঁর দজ্জাল মা। অধঃস্তন পুলিশদের একজন হয়ে গেলেন মহিলা আর মাদক পাচারকারীরাও হয়ে গেলেন মা ও মেয়ে।

ভৌমিক কাকু: গার্গী হয়েছিল পুলিশ সুপার।

তানাজিদা: গীতা বৌদি আর নেহাও ছিল। সোনার মাদুলির সময়ে আরেকটা ঘটনা। সে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে - জমিদার - ভৌমিক কাকু, তাঁর তিরিশ বছরের বিয়ে করা স্ত্রী - গার্গী, তাঁর ছেলে - আমি আর তার স্ত্রী - নেহা। বয়সের ফারাকটা খালি ভাবো! তাই আমরা বাধ্য হয়ে গার্গীকে করে দিলাম দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। আর আমি হলাম প্রথম পক্ষের ছেলে। কিন্তু প্রথম পক্ষের জমিদার গিন্নির একটা উল্লেখ তো রাখতে হবে! তখন ভৌমিক কাকু আর শ্রীলা কাকিমার বাঁধানো একখানা ফটো মঞ্চে টাঙিয়ে দেওয়া হল।

সিসিডি: মানে Reel Life আর Real life মিলেমিশে একাকার।

ভৌমিক কাকু: একদম। তবে এই সব Improvisation করলেও নাটকের মূল সুরটা কখনো বিকৃত হয়নি।

দীপক কাকু: আরেকটা Constraint ছিল stageটা।

ভৌমিক কাকু: হ্যাঁ। আট বাই কুড়ি বাই পনেরো। আট ফুট Height, কুড়ি ফুট চওড়া আর পনেরো ফুট Depth।

দীপক কাকু: রবিবার দিন দুপুরবেলা তানাজি কাগজ পেন্সিল নিয়ে আঁকজোক কাটছে। তিনজনে মিলে মাথা ঘামাচ্ছি - কোথায় কি করে দৃশ্য পরিকল্পনা হবে।

সিসিডি: খুব challenging।

তানাজিদা: চ্যালেঞ্জ না, আমার মনে হয় ঐটুকুর মধ্যেও সব করাটাই আনন্দের ব্যাপার।

ভৌমিক কাকু: ঠিক বলেছ তানাজি।

সিসিডি: শান্তি জেঠিমা, তোমার লক্ষ্মণের শক্তিশেল এর গল্পটা বলো।

শান্তি জেঠিমা: নাটক করাতে গিয়ে বুঝলাম লক্ষ্মণের শক্তিশেলের ভাষা বেশ শক্ত, তার উপর কঠিণ সংস্কৃতঘেঁষা উচ্চারণ। ও আমার সব বাচ্চারা পারবে না।

ওই রকম একটা বিখ্যাত নাটক, তাতে কলম চালাতে একটু ইতস্ততঃ করেছিলাম। কিন্তু, শরৎচন্দ্রের গল্প থেকেও যখন সিনেমা হয়েছে, তখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে - সেটা মনে রেখে আমি নাটকটা সহজ বাংলায় লিখিয়ে নিয়েছিলাম।

বাচ্চারা খুব ভালো করেছিল। ফেস্টিভ্যালেও গিয়েছিল, সবাই খুব প্রশংসা করেছিল।

ভৌমিক কাকু: একটা বাচ্চাদের নাটক হয়েছিল - 'অশোকবনে সীতা'। '73 বা '74 সালে বোধহয়। এটা কে পরিচালনা করেছিলেন?

শিবানী কাকিমা: আমি। নাটকের গল্পটা অশোকবনে যারা ছিল তাদের সবাইকে নিয়ে। বেশিরভাগই স্ত্রী চরিত্র।

ভৌমিক কাকু: ওটার সম্বন্ধে একটু কিছু বলুন না। দারুণ হয়েছিল। ঝুমকি আর বনু (ইন্দ্রাণী সেন) করেছিল।

তানাজিদা: সরমা আর শূর্পনখা করেছিল দু'জনে।

ভৌমিককাকু: হ্যাঁ। হ্যাঁ।

শিবানী কাকিমা: এই নিয়ে একটা গল্প বললে তানাজি রাগ করবে। তবু বলি। ঐ নাটকটায় দুএকজন দ্বাররক্ষী ছাড়া আর সব স্ত্রী চরিত্র। তানাজি তখন খুব ছোট, ওকে একজন দ্বাররক্ষী বানিয়েছি। এদিকে তানাজির খুব নকল দাড়ি চুলের শখ। নাটক করবে আর ঐ সব থাকবে না সেকি হয়! সেসব যোগাড় হল।

নাটকের দিন সেসব লাগিয়ে ঠিক অভিনয় শুরু হওয়ার আগে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল। দর্শকদের মধ্যে থেকে কমলদা - কমল চক্রবর্তী ছুটে এসেছেন- "তানাজি কাঁদে কেন?!" তানাজি কাঁদতে কাঁদতে বলল ঐ সব দাড়ি গোঁফ চুল নাকি খুব চুলকাচ্ছে। শেষে এতো দাম দিয়ে কেনা জিনিসপত্র কমলদা সব টেনে খুলে দিলেন। দিয়ে বললেন "যাও এইবার পার্ট করোগে"।

তানাজিদা: (হাসতে হাসতে) দিলে তো হতে হাঁড়ি ভেঙে।

শিবানী কাকিমা: ওই একই নাটকে আরেকটা চরিত্র ছিল রাবণের মা নিকষার। তো আর মেয়ে পাচ্ছিনা তখন এনসিএলে আমাদের বাড়ির কাছেই থাকত সুভাষ বলে একটি ছেলে ও

তখন এইট-নাইনে পড়ে। তাকেই ধরলাম "কিরে! আমার নাটকে কুঁজো নিকষা বুড়ির রোল করবি?" (সুভাষ) বলল "হ্যাঁ জেঠিমা। কেন করব না?" তারপরের দিন রিহার্সালের সময় বুঝলাম এত সহজে কেন রাজি হয়েছিল। আমি সাড়ে তিনটের সময় রিহার্সাল ডাকতাম। ওদের স্কুলের ছুটির পরে। এসে, ব্যাগ রেখে সবকটা গিয়ে চড়েছে বাড়ির বাগানের তেঁতুল গাছে। সবার মুখে ভর্তি পাকা তেঁতুল, শেষে শঙ্কর (ঘোষ) লাঠি নিয়ে সবকটাকে তাড়িয়ে রিহার্সালে নিয়ে এলো। তারপর থেকে রোজ এই চলত। গাছে গিয়ে উঠতো, শঙ্কর ডাকতো "সুভাষ!", এমনি গাছ থেকে ঝুপ করে নেমে এসে সোজা নিকষা বুড়ি। কিন্তু সুভাষ খুব ভালো অভিনয় করেছিল। খুব আগ্রহ। আর নাটকটা খুব ভালো হয়েছিল।

ভৌমিক কাকু: হ্যাঁ দুর্দান্ত হয়েছিল।

সিসিডি: শান্তি জেঠিমা! নতুন যারা বাচ্চারা আসে তাদের কিভাবে গ্রুম করো? প্রতিবছরই তো কেউ না কেউ নতুন আসে।

শান্তি জেঠিমা: বাংলা ভাষাটা যাদের একটু দুর্বল তাদের একটু আলাদা করে ডেকে নিয়ে শেখাই। প্রতিবারই করতে হয়। আমার নিয়ম হচ্ছে যতক্ষন আমার বাড়িতে রিহার্সাল দিচ্ছ ততক্ষণ সমস্ত কথা বাংলায় বলতে হবে। ওরাও তো বাচ্চা! একটু সুযোগ না দিলে একটা ভাষা শিখবে কি করে?

সিসিডি: এটা একটা খুব সহজ অথচ কাজের নিয়ম।

শান্তি জেঠিমা: হ্যাঁ এরকম করেই অনেক বাচ্চাকে দেখেছি বাংলা ভাষাটাকে ভালোবাসতে বাংলা শিখে নিতে এমনকি বাইরে থেকে এসে বাংলা শিখে গেছে এরকমও আছে। স্বাতীর (সোম) বাচ্চাদের উৎসাহ দেখে আমিই অবাক হতাম।

তবে হ্যাঁ, বড়দের নাটকে যেমন সময় নির্দিষ্ট করা থাকে, ছোটদের নাটকে কিন্তু বাচ্চাদের মতই চলতে হবে। সবারই নানারকম কাজ - জন্মদিন, অন্যান্য ক্লাস, পরীক্ষা, পড়াশুনো। এইটা মাথায় রাখতে আমার নিজেকে ফাঁকা রাখতে হয়। বাচ্চাদের মায়েরা খুব সাহায্য করত।

সিসিডি: বাচ্চাদের শেখাতে গেলে তো অভিভাবকদের আগ্রহ থাকতেই হবে...

শান্তি জেঠিমা: হ্যাঁ আমি বলতাম তো আমি বাচ্চাদের বকব না আগে মা দের বকব

ভৌমিক কাকু: সিসিডি! ওটা অভিভাবক না,অভিভাবিকা হবে। বাবারা কিসসু করে না।

শিবানী কাকিমা: হে হে হে।

নাটকের অনেকগুলো টেকনিক্যাল ব্যাপার থাকে - মঞ্চসজ্জা, আলো, শব্দ, আবহ সংযোজনা। দীপক কাকু, এগুলোর জন্য তুমি এখনো আমাদের ভরসা। প্রথমদিকে এগুলো কিভাবে manage করতে আর সময়ের সাথে সাথে কি ভাবে পরিবর্তন এলো?

ভৌমিক কাকু: He was always an expert…

দীপক কাকু: (হেসে) আমাদের পশ্চিম পুণেতে বিদ্যাবিজয় প্রথম থেকে শিখিয়ে গেছে যে, যা কিছুই করবে পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করতে থাকো। প্রথম দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য থাকতো এই অভ্যেসটা কে গড়ে তোলা। আর যদি দেখো তুমি যতগুলো বিভাগ বললে তার প্রত্যেকটাতে পরবর্তী প্রজন্ম আজ তৈরি হয়ে গেছে।

ভৌমিক কাকু: Direction। Acting।

দীপক কাকু: Backstage। সবেতেই।

সিসিডি: নাটক নিয়ে বাঁধাধরা ছকে না থেকে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে পৃথিবীজুড়ে। PPBPর নাটকে কি ধরণের এক্সপেরিমেন্টেশন হয়েছে সেটা নিয়ে একটু কথা হোক।

ভৌমিক কাকু: প্রথম প্রথম কমেডির মধ্যে থাকলেও পরের দিকে নানারকম থিম explore হয়েছে। একটা নাটক মনে পড়ছে যেটাতে গার্গী গৃহবধূ থেকে নেত্রী হয়ে উঠলো..

তানাজিদা: পতিপক্ষ।

ভৌমিক কাকু: হ্যাঁ। আর গত কয়েক বছরে তো খুব অন্যরকম নাটক হয়েছে। হনুমতী পালা খুব অন্যরকম ছিল।

সিসিডি: আমার মনে হয় হেলমেটটাও ভালো ছিল।

ভৌমিক কাকু: হ্যাঁ ওটাও different ছিল। যতই younger audience এসেছে তত রুচি বদলেছে। এখন আর লোকে শুধু হাসার জন্য নাটক দেখতে আসে না। তাই experiment করাও সম্ভব হয়েছে।

সিসিডি: নাটকের অন্যান্য ফর্ম যেমন মূকাভিনয়, শ্রুতিনাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, আড্ডা - এগুলোও কি এক্সপ্লোর হয়েছে? কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করো।

শিবানী কাকিমা: মূকাভিনয় কখনো হয়নি। আমার মনে পড়ে না

ভৌমিক কাকু: তবে কালমৃগয়ায় আমি অভিনয় করেছিলাম। নৃত্য নাট্য। অভিনয়, গান,

নাচ সব মিলিয়ে। দিলীপদা - দিলীপ রায় করিয়েছিলেন।

শান্তি জেঠিমা: দিলীপের প্রত্যেকটা কাজ খুব ভালো হতো। আমার মনে হয় এখন যারা পুণেতে নাটক নিয়ে কাজকর্ম করে, তারা সবাই দিলীপের কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখেছে।

তানাজি: দিলীপকাকু মূলতঃ গানের লোক ছিলেন। সাগর সেনের ছাত্র। দারুণ গান গাইতেন। কিন্তু দর্শকদের দৃষ্টিভঙ্গি - তারা কি চায়, কোনটা ভালোবাসবে এটা দিলীপকাকুর মতো আর বোধহয় কাউকে বুঝতে দেখিনি। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্যের মধ্যে নাটকীয়তা কিভাবে ঢোকানো যাবে এটা দিলীপকাকু অসম্ভব সুন্দর বুঝতেন। He was way ahead of his time।

সিসিডি: নাটক হবে আর কিছু গুলিয়ে যাবে না এতো হতেই পারে না। আর এই গুলিয়ে গেলে তখন হয়ত খুব খারাপ লাগে। পরে সেটাই একটা বলার মত গল্প হয়। এরকম দুএকটা মজার গল্প শোনাও না।

তানাজিদা: রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে অনেক খোঁজাখুঁজি করে পুজোর দর্শককে দেখানো যাবে এরকম নাটক ঠিক করা হলো। শেষ রক্ষা।
নাটক চলছে, হঠাৎ কারেন্ট অফ হয়ে গেল। আমাদের তখন জেনারেটর থাকত না। খুব আফসোস হয়েছিল।

ভৌমিক কাকু: কিন্তু শান্তনু মৈত্র শেষ অব্দি বসে দেখেছিল নাটকটা। পরেরদিন বলেছিল ভালো লেগেছে।

শান্তি জেঠিমা: বাচ্চাদের নাটকে এক খুদের ছোট বাইরে পেয়ে গেছে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে টুক করে বাথরুমে গেছে। ওরি মধ্যে তার একটা সংলাপ অন্য একটা বাচ্চা বলে দিয়েছে। বাথরুম থেকে ফিরে এসে সে যে কান্না জুড়ল। "আমার ডায়লগ ও বলে দিয়েছে, আমি আমার ডায়লগ আবার বলব।"

দীপক কাকু: ডায়লগ বলার ভুলের গল্প কি আমাকেও বলতে হবে?! নাকি আমার গল্প বাকিরাই বলবে। একবার আমি সংলাপ বলতে বলতে তিনপাতা পেরিয়ে গেছিলাম। আমি একদিকে আর পল্লব আরেকদিকে।

ভৌমিক কাকু: আর শ্রীলা - আমাদের প্রম্পটার একবার স্টেজের এদিকে, আরেকবার ও দিকে - দৌড়ে দৌড়ে প্রম্পট করছে।

সিসিডি: আমার মনে হয় ভালো হবে যদি শ্রুতিনাটকের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটু আলাদা করে কথা হয়।

তানাজিদা: PPBPর শ্রুতি নাটকের ইতিহাস নিয়ে একটু বলব। প্রথম যেটা হয়েছিল সেটা হল - 'প্রস্তাব' আন্তন চেখভের একটা নাটকের বাংলা অনুবাদ।

সেই থেকে শুরু করে আমরা বেশ কয়েকটা শ্রুতিনাটক করেছি। বিশেষ করে দিশারীর বার্ষিক শ্রুতিনাটক উৎসবে প্রতিবছরই আমরা কিছু না কিছু করতাম।

একটা খুব সুন্দর নাটকের কথা মনে পড়ছে বিমল বন্দোপাধ্যায়ের একটি অবাস্তব গল্প। এই নাটকটা শ্রুতি নাটকের মত করে লেখা ছিল না, আমাদের অনেক edit করতে হয়েছিল। নাটকে একজন ফাঁসির আসামী ফাঁসি দেওয়ার পরেও মরেনা। তাকে বাঁচিয়ে তোলার দৃশ্যটা ছিল খুব নাটকীয়। আমি সে বার প্রথম বার শ্রুতিনাটকের নির্দেশনা করেছিলাম কিন্তু এই দৃশ্য আমার ডাক্তারি কাজে লেগে গেছিল।

রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে ওই দিশারীরই নাট্য উৎসবে আমরা করেছিলাম 'ভুল স্বর্গ'। Live গান ছিল অনেকগুলো। আর শেষের দিকে আমরা একজন Sand Artist কে দিয়ে মঞ্চের পেছনে পর্দায় Live Projection করেছিলাম। দর্শকাসনে ছিলেন গৌরী ঘোষ নাটকের পরে উনি আমাকে বলেছিলেন "তোমরা প্রবাসে থেকে এত সুন্দর প্রযোজনা করেছ, যে আমরা কলকাতায় থেকেও পারবোনা।" ওঁরা এত বড় মাপের শিল্পী তবু এত Humility, ওঁদের প্রশংসা আমার কাছে একটা বড় Certificate।

সিসিডি: গত ষোল বছরের এই যে সুদীর্ঘ ইতিহাস, এর মধ্যে থেকে তোমাদের মনে দাগ কেটে গেছে এরকম একটা প্রযোজনার কথা বলো। কেন দাগ কেটে গেছিল সেটাও বলতে হবে।

শান্তি জেঠিমা: আমি লক্ষ্মণের শক্তিশেল আর আজব বাক্সর কথা বলব। বাচ্চারা যা করেছে সব ভালো।

শিবানী কাকিমা: PPBPতে আমি খুব বেশী নাটক করাইনি। আমার মনে রাখার মত লাগে - লক্ষ্মীর পরীক্ষা। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা, তাঁর ভাষা - আমরা কিন্তু কোন অদল-বদল করিনি। বাচ্চারা এত সুন্দর করেছিল!

বাচ্চাদের জন্য এই নাটকটা অনেক শিক্ষার বিষয় ছিল - মানুষকে মর্যাদা দেওয়া, সবাইকে ভালোবাসা, লোভ না করা, শক্তিমানের তোষামোদ না করা। তবে সবচেয়ে জরুরী কথা হল - দান করো, দানে মানুষের ধন না বাড়তে

পারে, কিন্তু মন ভরে। আমাদের বাচ্চাদেরও দান করা শেখানো উচিত।

দীপক কাকু: আমার ফেভারিট 'বল্লভপুরের রূপকথা'। আমাদের অপু একটাতে করেছিল···

সিসিডি: হানিমুন কি!?

ভৌমিক কাকু: হ্যাঁ ওর সেটটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল। একটা ব্যালকনি করা হয়েছিল।

দীপক কাকু: গানটা যেন কি ছিল!?

তানাজিদা: "এই করেছ ভালো নিঠুর হে!" প্রেমিকের গলায় প্রেমিকার জন্যে সিগনাল।

দীপক কাকু: প্রেমিকা এলো না। তার দাদু বেরিয়ে এসে বলল "নিঠুর আর কি করেছে বলবি তো!!"

তানাজিদা: (হাসতে হাসতে) আমাদের নাটকে অনেক সময়ে ছোটখাটো চরিত্র থাকলে বাদ দিয়ে দিই। একটা দুটো সংলাপ থাকে - ওগুলো কেউ করতে চায় না।

নাটক চলছে। মঞ্চে বসার ঘরের সেট - পোস্টম্যান চিঠি দিতে আসবে। নেপথ্য থেকে একজন 'চিঠি' বলে ডাকবে আর আমি গিয়ে চিঠিটা নিয়ে নেব। তো নেপথ্য থেকে চিঠি বলে ডাক তো এলো কিন্তু চিঠিটা বাড়ির সদর দরজা দিয়ে এল না! এল বাড়ির বেডরুমের দিক থেকে। আমি সদর দরজায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বেডরুমের দিক থেকে গিয়ে চিঠিটা নিলাম।

সিসিডি: এবার তোমার ফেভারিট নাটক নিয়ে বলো তানাজিদা।

তানাজিদা: হনুমতী পালা। Total Entertainment package - সুন্দর একটা থিম, Beautiful সেট, costumes। আমরা প্রথমবার একটা যাত্রার আঙ্গিক আনার চেষ্টা করেছিলাম।

সিসিডি: LIVE নাচগানও ছিল।

তানাজিদা: চারটে গান ছিল। তাতে সুর দেওয়া, অন্বেষা খুব সুন্দর গেয়েছিল।

ভৌমিক কাকু: আমার সবই খুব প্রিয়। তবে হনুমতী পালা was one of the the best, if not the best। ছন্দপতনও আমার খুব প্রিয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা কথা মনে হয় - নাটক হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের খালি ভুলগুলো বিচার করা উচিত। ভালো কি হয়েছে সে তো দর্শক বলবেন। সেদিক থেকে হনুমতী পালাও আরো ভালো হতে পারত।

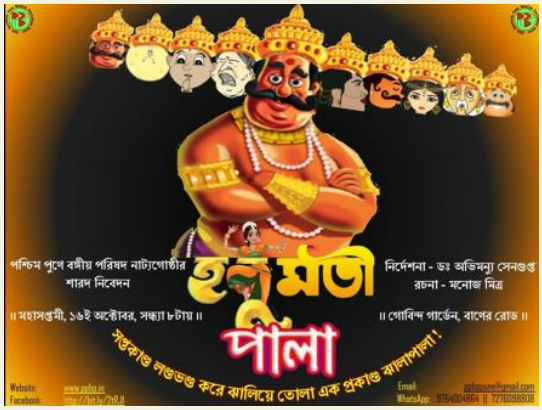

তানাজিদা: ভৌমিক কাকু, দীপক কাকু তোমাদেরকে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি। তোমাদের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং চরিত্র কোনটা?

দীপক কাকু: ঐ ভানুমতী পালা…

সবাই: হনুমতী পালা।

দীপক কাকু: (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ! ওই ভানুমতীর পালাতে আমার চরিত্র ছোট ছিল কিন্তু খুব crisp কমিক টাইমিং - বিশেষ করে চড় খাওয়ার দৃশ্য। একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

সিসিডি: কাকু তুমি পড়ে গেছিলে স্টেজে।

দীপক কাকু: হ্যাঁ সেই পড়া দেখে অনেকেই, মায় আমার গিন্নি অব্দি পরে জিজ্ঞাসা করেছে,"তুমি অত ভালো কি করে পড়লে!"

ভৌমিক কাকু: এই রে। খুব কঠিণ প্রশ্ন। আমার সব Alt Control Delete হয়ে যায়।

সিসিডি: ভবিষ্যতে PPBPতে কি ধরনের নাটক তোমরা দেখতে চাও? - ফর্ম আর কন্টেন্ট দুই হিসেবেই। যেগুলো তোমার মনে হয় কম হয়েছে বা হয়নি।

শিবানী কাকিমা: পুরনো সামাজিক নাটক আবার হওয়া উচিত। বাচ্চারা তো কখনো দেখেনি, ওরা দেখতে পারবে।

শান্তি জেঠিমা: আমারও মনে হয় পুরনো নাটকগুলো আবার হলে কিন্তু একটা চেঞ্জ হবে। বাচ্চাদের দিয়ে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত করানোর আমার খুব ইচ্ছে।

সিসিডি: মানে একটু ক্লাসিক্যাল সাহিত্যধর্মী নাটক। ভৌমিক কাকু তোমার কি মত?

ভৌমিক কাকু: যাত্রা। ফুল ফর্মে। visual লাগবে। পুজোতে করতে পারলে খুব ভালো হবে।

সিসিডি: দীপক কাকু! তোমার একটা ইচ্ছে তো আমি জানি - একক অভিনয়ের নাটক। অন্য কি বলো?

দীপক কাকু: পুজোর নাটক হিসেবে যাত্রা খুব ভালো হবে। ঐতিহাসিক গল্প লাগবে - ঐ চরিত্রগুলোকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

সিসিডি: তোমরা এতদিন ধরে নাটকের চর্চায় জড়িয়ে আছো। বয়সকে তোমরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনোনা। নাটকের জন্যে এই উৎসাহ আর উদ্দীপনা কোত্থেকে পাও? What's your motivation?

শান্তি জেঠিমা: আমাকে যখন কেউ বলে "তুমি কি এটা পারবে তখন আমার এটাই মনে হয় যে কেন পারব না?"

শিবানী কাকিমা: এ তো জন্মগত। ছোটবেলা থেকে করে এসেছি। এখনও করছি। যদ্দিন বেঁচে আছি করব। সুরঝঙ্কারে অবাঙালি ছাত্র ছাত্রীদের নিয়েও করেছি।

ভৌমিক কাকু: কি বয়স!? কার বয়স!? It's about Passion. যে কাজটা করতে তোমার ভালো লাগে, যে কাজটা তুমি ভালো পারো, সেই কাজটা করতে তুমি কখনোই ক্লান্তি বোধ করবে না। একটা স্ক্রিপ্ট থেকে শুরু করে মঞ্চে নাটক পরিবেশন করে দর্শকদের প্রশংসা পাওয়া - এটা অনেকটা একটা বীজ থেকে শুরু করে একটা ফলে ফুলে ভরা গাছ বড় করে তোলার মত।

দীপক কাকু: Passion টাই আসল। আমার তো কোনরকমে মঞ্চের সাথে জড়িয়ে থাকা নিয়ে কথা। মুখ্য চরিত্র, দীর্ঘ সংলাপ, এমনকি অভিনয় করা কোনটাই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। Participation টাই আসল।

সিসিডি: এখন অনেক নতুন মুখ এসেছে, প্রতিবছর আসছে। PPBPর ঐতিহ্য ধরে রাখতে আমাদের কি কি কথা মাথায় রাখতে হবে?

ভৌমিক কাকু: Walk the talk। Lead from the front without Ego।

সিসিডি: এটা একটা অনেক বড় কথা চট করে বলে দিলে।

দীপক কাকু: ধৈর্য্য। সময় পরিবর্তন হবে। কিন্তু Passion কে ধরে রাখতে হবে। নতুন প্রজন্ম মানে বাচ্চাদের বা তাদের বাবামাদের জন্য কোন মেসেজ?

শান্তি জেঠিমা: বাচ্চারা তো মাটির দলা। ওদের কিন্তু কোন দোষ নেই। একটা বাচ্চা যদি না শেখে তার পেছনে কিন্তু সম্পূর্ণ দোষ তার বাবা-মার। বাড়িতে একটু বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা করা খুব দরকার। পুরনো সময়টা কেমন ছিল, পরিবার-পরিজন কেমন ছিল এগুলো বাচ্চাদের বোঝানো দরকার।

শিবানী কাকিমা: বাড়িতে বাবা-মার বাংলা ভাষাতেই কথা বলা উচিত। বাচ্চারা আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে - দৈনন্দিন সমস্যা, ভালো লাগা, মন্দ লাগা সবকিছুতে বাচ্চাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাচ্চাদের শেখাতে হবে যে প্রতিবেশী, বয়স্ক মানুষ, সবার জন্যই তাদের কর্তব্য আছে আর একটা কথা তো আগেই বলেছি বাচ্চাদের শেখাতে হবে কি করে দান করতে হবে। সংসদে আমরা বাচ্চাদের দিয়ে কার্ড

বানিয়ে, সেগুলো বিক্রি করিয়ে, সেই টাকা আবার ওদের দিয়েই অনাথাশ্রমে দান করিয়েছিলাম।

সিসিডি: বাঃ কি সুন্দর করে বললে তোমরা সবাই। আমরা এবার এই আড্ডা শেষ করতে পারি। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। তিনঘন্টা সময় তোমরা বসে আমাদের গল্প বললে, গল্প শুনলে..

তানাজিদা: খুব ভালো কাটলো সময়টা। এবারে নাটক না হওয়ার দুঃখ অনেকটা কমে গেল।

শান্তি জেঠিমা: সিসিডি আর তানাজি, তোমাদেরও অনেক আশীর্বাদ। সবাইকে নিয়ে এত সুন্দর একটা আড্ডা হল।

সিসিডি: Thank you!

মূল ভাবনা: ড: সুশান কোনার

পরিকল্পনা: ড: অভিমন্যু সেনগুপ্ত, চন্দ্রচূড় দত্ত

অনুলিখন: চন্দ্রচূড় দত্ত

ছবি: ড: অভিমন্যু সেনগুপ্ত ও শ্রী দীপক চ্যাটার্জির ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে।

VIVEK is persuing his bachelor's degree in Computer Science from the Unversity of Califronia Davis.

He has acted in the Durga Puja natoks - cajoled, convinced and guided by Munshi Mashima from 2005 to 2015.

Acknowledgements

In 2020, Spandan steps into its third year. Starting out as an E-zine in 2018, the printed version of Spandan was launched in 2019. Unfortunate circumstances have forced us to go back to the electronic format again this year. But we fervently hope to bring Spandan out in its fully-fledged print version soon.

A magazine, electronic or print, is nothing without its contributors. We have been privileged to have a talented and accomplished PPBP community who always respond enthusiastically to our contribution call. We must apologise to the entire community for not being able to bring the magazine out before this, even with such tremendous response.

Of course, the magazine owes its very existence to the unwavering support of the PPBP management and a number of helpful well-wishers. It is difficult to name all of them here, but the unwavering encouragement, logistic help and important editorial inputs provided by Ashish Dhar, Abhimanyu Sengupta and Sandip Munshi have been crucial for the magazine.

Chandrachur Datta joined the Spandan team in 2020 to quickly become its soul. His vivacious personality instantly lightened up the dreary task of editing and without his gentle nudges the magazine may not have seen the light of the day within this calendar year. Of course, the entire credit for planning and executing the 'নাটকের বৈঠক', in collaboration with Dr. Abhimanyu Sengupta, goes to him.

Sushan Konar plays the role of an absconding editor, whose idea of editing a magazine consists of sending endless emails to people and bringing up the rear with a last-minute editorial, to perfection. The shortcomings, wherever they appear, must be attributed to her.

Meghna Bandyopadhyay is quite literally the 'one-woman' production team of Spandan, without whom the E-zine could not have happened. She single-handedly arranges, typesets, decorates and creates Spandan from the raw material arriving in diverse formats from PPBP members. A Marathi by birth, the aplomb with which she edits this (mostly) Bangla magazine is to be seen to be believed.

Ashish Dhar

Sandeep Munshi

Dr. Abhimanyu Sengupta

Sushan Konar

Chandrachur Datta

Meghna Bandyopadhyay

PASCHIM PUNE BANGIYA PARISHAD